আধুনিক জাপান

আনোয়ার হোসেন, এম-এ, বি-টি

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

আধুনিক জাপান

সূচনা

সভ্যতার ইতিহাসে জাপান এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলার জনৈক কবি ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অসভ্য জাপানের উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহাতে ভারতবাসী কতদূর জাগিয়াছে তাহা বলা কঠিন কিন্তু জাপান যে ক্রমশঃ আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম প্রতীক হইতে চলিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ঐ দিন কলিকাতার কোন সভায় চীনা মুসলিম মিশনকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া সভাপতি জাপানকে bastard child of civilisation এবং জাপানী সভ্যতাকে hybrid civilisation নামে অভিহিত করিয়াছেন। জাপান কি বাস্তবিকই তাই? রুশো-জাপানিজ যুদ্ধের (Russo Japanese war) পর হইতে জাপানের উপর পাশ্চাত্য সভ্য জাতির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ১৮৬৮ সনে মিকাডো সিংহাসনে বসেন, তখন হইতে জাপান বিদেশী সভ্যতা ও বাণিজ্যের সংস্পর্শে আসে। ইতিপূর্ব্বে বিদেশীদের জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

ঐ দিন জাপান জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করিতে সাহস করিয়াছে। আজ আবার চীনকে গ্রাস করিবার জন্য জাপান

উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মজার দেশ জাপান সম্বন্ধে এস্থলে দু'চারিটী বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। চীনা ভাষায় জাপানকে the land of the rising sun বলা হয়। উদীয়মান সূর্য্যের দেশ জাপান—উদীয়মান সূর্য্যেরই মতো জাপান দিকে দিকে তার প্রগতিশীল সভ্যতার কিরণ বিকিরণ করিতেছে। সে সভ্যতার আলোকচ্ছটায় আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাও যেন ম্লান হইতে বসিয়াছে; জাপানকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে জাপান কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। তার পরিমাণ ফলও খুব বেশী নয়, ৬৮১০১৯ বর্গ কিলোমিটার (উপনিবেশসহ), তাহার লোক সংখ্যা ৮ কোটী। ১৯১০ সনে কোরিয়া জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। জাপানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। সংবৎসরে চারি ঋতুর আবির্ভাব সেখানে নিয়মিত দেখা যায়—জাপান সৌন্দর্য্যের রাণী।

চেরীগাছ জাপানের সর্ব্বত্র। জাপানের প্রত্যেক বাড়ীর বাগানে চেরীগাছ। এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। সৌন্দর্য্যের পূজারীগণ তখন ফুলের আবহাওয়ায় বসিয়া চা পান করিতে খুব ভালবাসে। প্রত্যেক বাড়ীতে ও মন্দিরে ফুলের বাগান আছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূজা জাপানী চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য তাহারা পায়ে হাঁটিয়া শত শত মাইল দূরে যায়। পবিত্র সৌন্দর্য্যের পীঠস্থানে এ তীর্থ-যাত্রা বৈ আর কি? প্রায় প্রত্যেক ঋতুতে সেখানে এক এক জাতীয় ফুল ফোটে—এক সময় চেরী, অন্য সময় চন্দ্রমল্লিকা।

জাপানীরা বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের উপাসক, প্রকৃতির লীলা-নিকেতন জাপান, নানাজাতীয় পশুপক্ষী, মাছ, বৃক্ষলতাদি এবং ফলফুলে ভরপূর পর্ব্বতসঙ্কুল এ দেশ—নদী, হ্রদ, সাগর, উপসাগর, জলপ্রপাত, গভীর খাদ ইত্যাদির আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় এই বিচিত্র দেশে। এখানে ৫০০ এর বেশী উষ্ণ ফোয়ারা আছে, সমগ্র য়ুরোপে তার অর্দ্ধেক আছে কিনা সন্দেহ। স্বাস্থ্যান্বেষী ভ্রমণকারীরা এই সব উৎসে স্নান করিয়া স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়।

সাগরমেখলা জাপানকে আত্মরক্ষা ব্যাপারে বেশী বেগ পাইতে হয় না। ২৬০০ শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ জাপান সাম্রাজ্য আপন গরিমায় সমুদ্রের বক্ষে ভাসমান আছে, কিন্তু এযাবৎ কোন বিদেশী শত্রু জাপান আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। আবার এইরূপ সমুদ্রপরিবেষ্টিত বলিয়াই জাপান অন্যান্য সভ্যতার কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ৫৫২ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন দেশের মধ্য দিয়া জাপানে প্রথম প্রবেশ করে। অনুমান ৬০৭ খৃষ্টাব্দে জাপান ও চীনের মধ্যে পণ্ডিত-মণ্ডলী বিনিময় করা হয়, সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিবেষ্টন এবং বন্ধুজনোচিত মধুর সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য।

জাপানে প্রাকৃতিক এবং নকল park অনেক আছে। ফুজী ও কঙ্গো পর্ব্বত এবং অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণী জাপানের অতুল সৌন্দর্য্যের আকর। টোকিও জাপানের রাজধানী—লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষ (কলিকাতা ?)। ১৯২৩ সনের ভূমিকম্পের পর টোকিও

পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি, শাসন, যুদ্ধ ব্যাপার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র টোকিও এবং ওসাকা (লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ)। কোবে (জাপানে ৫ম), ইয়াকোহামা প্রভৃতি বন্দরের মারফৎ জাপানের সঙ্গে সভ্যজগতের পরিচয় ঘটিয়াছে।

যান্ত্রিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত মাল মসলা, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থান, শিক্ষা, চরিত্র, লোকবল ও ধনবল জাপানের আছে। জাপানে প্রচুর কয়লার খনি আছে; খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। য়ুরোপের Industrial Revolution-এর (শিল্প বাণিজ্যের কল্পনাতীত এবং আকস্মিক পরিণতি—১৭৬০ খৃঃ) ইতিহাসেও দেখা যায়, কয়লাই যান্ত্রিক সভ্যতার খোরাক জোগাইয়াছে, কয়লার সঙ্গে যখন লৌহ যোগ দেয় তখন সোনায় সোহাগা মিলন ঘটে। যন্ত্র দানবের বংশ রূপকথার দানবের বংশের ন্যায় রাতারাতি স্বল্পপরিসর পৃথিবীর বুক চিরিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত এবং আলোড়িত করিয়া তোলে। জাপানে এইসব মাল মসলার অভাব নাই। কাজেই জাপানে যন্ত্রদানব অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছু দেরীতে প্রবেশ করিয়াছে বটে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে সমস্ত দেশটাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। জাপানে অসংখ্য জলপ্রপাত আছে। হাইড্রলিক স্কিম অনুযায়ী অতি সস্তায় জলপ্রপাতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এবং তাহা দ্বারা কলকারখানা চালানো হয়।

১৮৭০ সনের পর হইতে জাপান আধুনিক capitalism

গ্রহণ করে। ইতিপূর্ব্বে কৃষিই ছিল জাপানীদের প্রধান ব্যবসা। সভ্যতার অতি আদিম, নিতান্ত অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য, সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা এই কৃষির কথা ধরা যাক্। ১৯২৮ সনে জাপান ধান, রেশম, গুটি, যব, গম, ফল, শাক-সব্জী ইত্যাদি রপ্তানি করিয়াছিল ১৫৭৯৭৪২ ডলার মূল্যের। জাপানে small scale cultivation-ই চলে। শতকরা ৭০ জন কৃষক গড়ে প্রত্যেকে মাত্র ২·৪ একর জমির মালিক। সমগ্র জাপানের মাত্র ১৫·৫ ভাগ কৃষির উপযুক্ত আর বাকী পাহাড় পর্ব্বতে ঘেরা। এই কৃষির উপর শতকরা ৫৫ জন নির্ভর করে (ভারতে ?)। নিম্নে কয়েকটী দেশের তুলনা মূলক অবস্থা দেখান হইল। ইহা ১৯২৬ সনের হিসাব।

দেশের নাম	মোট জমির মধ্যে শতকরা কত জমি চাষের উপযোগী হেকটার	মাথা পিছু কত জমি প্রত্যেকের আছে হেকটার
ভারত	৪৫·৯	·৫০
ফ্রান্স	৪১·৮	·৫৮
গ্রেটবৃটেন	২৩·৮	·১২
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১৮·৫	১·২৩
জাপান	১৫·৫	·১০

N. B. হেকটার—২½ একর

জাপান বিদেশ হইতে প্রচুর সার আমদানী করিয়া থাকে।

সম্প্রতি National Union of Farmers' Co-operative Association—১৯২৩ সনে ইহা স্থাপিত হয়—কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা নিজ দেশে সার উৎপাদনের জন্য বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়াছে। মানুষের মলও জাপানে বৃথা নষ্ট হয় না। জাপান তাহার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার খোরাক যোগাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী পুরুষ সবাই সেখানে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। প্রাচীন ও আধুনিকের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ এই আজব দেশ জাপান। একদিকে তা'র ২৬০০ বৎসরের পুরাতন সভ্যতা, রাজনীতি, জীবনধারা, সংস্কার এবং জাতীয়তা, আর অপর দিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ। দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানা হেচড়ায় জাপান ঠিক তাল সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই জন্যই হয়ত জনৈক ভ্রমণকারী মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানীরা প্রথমতঃ পাশ্চাত্য হ্যাট কোট পরিতে গিয়া মহা মুস্কিলে পড়িয়াছিল। জাপান অতি তাড়াতাড়ি বিদেশীর অনুকরণে আপনাদের জীবন যাত্রার অনেক খুঁটীনাটী বদলাইয়া নিয়াছে কিন্তু পুরাতনকে তাহারা বিদায় করে নাই। জনৈক ভ্রমণকারী জাপানের দোটানা ভাব দেখিয়া ইহাকে land of paradoxes বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জাপানী জীবনের প্রতি স্তরে স্বাদেশিকতা এবং বিদেশীপনার দ্বন্দ্ব লাগিয়া রহিয়াছে।

জাপানী শিল্প-বাণিজ্য

'Made in Japan' অঙ্কিত দ্রব্যসম্ভার আজ পৃথিবীর অলিগলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কাপড়, জুতা (চাম এবং রাবার), নকল ও আসল রেশম, Rayon এবং Lacquer শিল্প, কলকব্জা তৈয়ারী, মটর, এরোপ্লেন, কাগজ, কাগজের লণ্ঠন, চীনামাটীর বাসন, হ্যাট, নানাবিধ ধাতু দ্রব্য, পাথরীভূত কাঠের তৈয়ারী জিনিষ, ফটিক, ঝিনুক, মুক্তা, লৌহদ্রব্য, গ্রামোফোন, গ্লাস, সূচ, knitting looms, খেলনা, বেত ও বাঁশের জিনিষ, নকল ফুল, কারুকার্য্যময় মাদুর ইত্যাদি নানাজাতীয় জিনিষ উৎপন্ন হয় এই আজব দেশ জাপানে। Keiben Paste-এর সাহায্যে মোজা ইত্যাদি সহজে সেলাই ও মেরামত করা যায়; ইহাতে আর সেলাইএর সূচের দরকার পড়ে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপরই জাপানীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। জাপান দুনিয়ার পৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিতে চায়—আধমরা হইয়া নয়—জীবন্ত ও সুস্থ জাতি হিসাবে। জাপান অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতির দুর্দ্দমনীয় প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, জাপান তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে অচিরে পৃথিবী জয় করিবে—যেমন অস্ত্রের সাহায্যে জয় করা হয়। Commercial Penetration এবং Imperialistic Penetration কি বাস্তবিক একই কথা? কথা হয়ত এক নয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে

পাই? বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের মূলে কি? উপনিবেশ স্থাপন এবং বাজার সম্প্রসারণ; অস্ত্রবলে রাজ্যজয়ের নামান্তর নয় কি?

কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন যে অদূর ভবিষ্যতে সুদূর প্রাচ্যই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার (বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুতরাং রাজনীতি ক্ষেত্রে) লীলানিকেতন হইবে। আর জাপান দাঁড়াইবে এই প্রতিযোগিতার কেন্দ্রস্থলে। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিবে অনেকাংশে এই উক্তির সত্যতা এবং সারবত্তা।

যন্ত্রদানব সাধারণতঃ মানুষকে ভোগবিলাস-মত্ত এবং আত্মসর্ব্বস্ব করিয়া থাকে; সৌন্দর্য্য বোধ ও তাহার বিকাশে প্রবল বাধা জন্মায় এই দানব। জাপান সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন—ছোট দেশ বটে কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া জাপান খুবই বড়। জাপানী মন এখনও সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জাপানীদের সামাজিক এবং ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে আর তাহাদের কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অপূর্ব্ব-প্রতিভার বিকাশে। তাহাদের ফুল-সজ্জা এবং চায়ের অনুষ্ঠান সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক—তাহাদের উৎপন্ন কোন কোন দ্রব্যে প্রকৃত শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। জাপানীরা এখনও মনে করে যে সে দেশে যন্ত্রদানব এবং আধুনিক ধনিক মনোবৃত্তি তাহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি এতটুকু ম্লান করে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাশে দাঁড়াইয়া আছে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য—পুরাতনের পাশে আছে নূতন।

গত ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের পর জাপানের দৃষ্টি কৃষির

দিক হইতে বাণিজ্য ও শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯২৩ এবং ১৯৩১ সনের মধ্যে জাপানে কৃষির অবনতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরীতে যে সব মজুর কাজ করিত তাহাদের সংখ্যা ছিল ১৯৩৬০০০;—১৯৩২ সনের পর ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দুনিয়াজোড়া আজ ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা মন্দার ঢেউ উঠিয়াছে, তবুও জাপানে কারখানার সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ কি? একটা কারণ হইতে পারে—জাপানের শিল্পপ্রচেষ্টা খুবই আধুনিক। এই সেদিন মাত্র জাপান শিল্পের ক্ষেত্রে আসিয়াছে। নূতন শক্তি, নূতন উদ্যম তার—নূতন বেগে ছুটিয়াছে আজ দুনিয়া জয় করিতে।

'Made in Japan' জিনিষ আজ দুনিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে মনে হইতে পারে জাপান কেবল জিনিষ রপ্তানিই করে—আর আমদানী করে না। জাপান যেমন উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করে আবার সেরূপ প্রচুর কাঁচামাল বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানীও করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপান পারস্পরিক সহযোগিতা, চুক্তি ও নিয়ন্ত্রণমূলক স্বাধীন বাণিজ্যে বিশ্বাস করে। সর্ব্বত্র আজ বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা ভীষণ লড়াই সুরু হইয়াছে—একটা অন্ধ প্রতিযোগিতার তুফান উঠিয়াছে। যে শক্তিশালী সে চায় দুর্ব্বলকে পিষিয়া মারিতে। এই সর্ব্বনাশী প্রতিযোগিতামূলক লড়াই থামাইবার জন্য জাপান 'give and take' নীতির

অনুসরণ করিতে প্রয়াসী—বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানী না করিলে জাপানের কলকারখানার খোরাক যোগান দায়। আবার বিদেশে জিনিষ রপ্তানি করিতে না পারিলে জাপানের একদিনও চলে না। তাই জাপান যথাসম্ভব বিদেশীদের সহিত বন্ধুতামূলক আদান প্রদানের ভিত্তির উপর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে চায়। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সনে জাপানের সঙ্গে ভারতের, ইংলণ্ডের এবং ডাচ্ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। নূতন জাপ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তি অনুসারে জাপান প্রতিবৎসর ভারত হইতে ৫ লক্ষ বেইল কাঁচা তুলা খরিদ না করিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় ভারতে রপ্তানি করিতে পারে না। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও জাপানের বাণিজ্য-চুক্তি আছে—নিবে আর দিবে এই হইল জাপানের বর্ত্তমান নীতি। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হিরোটা বলেন, "আমরা তোমাদের (অন্যদেশের) তুলা, রাবার, দস্তা, সীসা, কাঠ ইত্যাদি খরিদ করিব আর তোমরাও আমাদের উৎপন্ন দ্রব্য অবশ্য কিনিবে।" জাপানী জিনিষ যদি অন্যদেশে বিক্রী হয় তাহা হইলে অন্য দেশের কাঁচামালও প্রচুর পরিমাণে জাপানে বিক্রী হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এইতো মূলনীতি!

জাপানের শিল্প-প্রচেষ্টা কেবল স্বদেশেই আবদ্ধ রহে নাই; জাপানের বাহিরেও অনেক জাপানী শিল্পপতিষ্ঠান, কল-কারখানা, রেলওয়ে কোম্পানী, রাবার বা মাছের কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে জাপানী অর্থে গঠিত

এবং চালিত। Russo-Japanese Fishing Company, Manchou Telegraph and Telephone Company এবং অসংখ্য Rubber Company দেশ বিদেশে কাজ করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর তুলনা চলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে; ইহার মূলধন ১৯৩৫ সনে ছিল ৮০ কোটী ইয়েন। ইহা একটী অর্দ্ধ সরকারী রেল লাইন।

এছাড়া বিদেশে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী গড়িবার এবং তাহাদিগকে মূলধন দিবার জন্য জাপানে অনেক সুব্যবস্থা আছে—Oriental Colonization Company, South America Colonization Company—এই দুইটীই সব চেয়ে বড়। প্রথমোক্ত কোম্পানীর মূলধন ৫ কোটী ইয়েন।

বিদেশে কোম্পানী গড়িয়া অর্থ উৎপাদনের চেষ্টা ছাড়াও জাপান নিজ দেশে বিভিন্ন ছোট-খাটো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। টাকার অভাবে কেহ কোন নূতন কলকারখানা করিতে পারিবে না, এমন ঘটনা জাপানে বড় একটা দেখা যায় না। বড় বড় কলকারখানার পাশাপাশি ছোটখাটো কারখানাও প্রচুর আছে সেখানে। ছোট দরের কৃষক আর ছোট দরের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক—এরাই জাপানের জাতীয় জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর। অধিকাংশ লোক এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত, আর যত জিনিষ সেখানে উৎপন্ন হয়—রপ্তানি বা দেশে ব্যবহারের জন্য—তার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় এই শ্রেণীর ছোট দরের কারখানায়

মালিকদের হাতে। শতকরা গড়ে ৭০% জন এইরূপ কলকারখানার মালিক। ১৯২৬ সনের হিসাবে দেখা যায় দেশে যত ফ্যাক্টরী আছে তা'র শতকরা ৯৯টী ছোট দরের (small scale)—ইহারা উৎপন্ন করিয়াছে ২৮২ কোটী ডলার আর বড় দরের কারখানা উৎপন্ন করিয়াছে ১৩৩ কোটী ডলার মূল্যের জিনিষ।

জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের মূলে আছে সে দেশের ব্যাঙ্ক; বিশেষ করিয়া বংশানুক্রমিক ভাবে যাহারা জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে এরূপ তিনটী বংশ—মিৎসুই, মিৎসুবিশী এবং সুমিটমো। এই সব ধনকুবের অজস্র অর্থের মালিক; রাশি রাশি অর্থ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটাইতেছে। জাপানের অর্থনৈতিক জগতে ইহাদের ক্ষমতা অসীম এবং সুদূরপ্রসারী। এমন কোন শিল্প-বাণিজ্য নাই যাহা ইহাদের হাতে নাই। এরূপ একচেটিয়া ধনের ব্যবসা ইহারা কিরূপে হস্তগত করিল?

য়ুরোপ বা আমেরিকায় যখন রাশি রাশি মূলধনের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হয়, তাহার অনেক পরে জাপানে কোটী কোটী টাকার মূলধন খাটাইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য নিয়মে যখন মূলধনকে ভিত্তি করিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির দিকে মন দেওয়া হয় তখন জাপানে অল্পসংখ্যক উৎসাহী লোকই মূলধন সরবরাহের নায়কত্ব গ্রহণ করে। সর্ব্বসাধারণ এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই কারণ এ ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা সক্রিয় হইয়া

উঠিবার মত যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ছিল না—এত দ্রুত সেখানে মূলধনের রাজত্ব স্থাপিত হয়! বন্যার জলের মত ভীষণ বেগে দেশের শিল্প-বাণিজ্য কতিপয় ধনকুবেরের কুক্ষিগত হয়। সাধারণ লোক সে সুযোগ পায় নাই। যাহারা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহাদিগকেও ঐ সব ধনকুবের গ্রাস করিয়া ফেলে। ১৯২০ সনের ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধির পর জাপানে একটা মন্দার ঢেউ উঠে—সর্ব্বত্র ত্রাস, অনিশ্চয়তা এবং নিষ্ক্রিয় ভাব। তারপর ১৯২৩ সনের ভূমিকম্পে টোকিও সহর একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। এখানেই শেষ নয়। ১৯২৭ সনে সারা জাপানে একটা অর্থনৈতিক ত্রাসের সঞ্চার হয়। এসব কারণে সাধারণ ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান একেবারে ধ্বংসের কবলে পতিত হয়, আর সেখানে দ্রুত গজাইয়া উঠে একচেটিয়ার রাজত্ব। মিৎসুই, মিৎসুবিশী ইত্যাদি ধনকুবেরগণ এই দারুণ দুর্দ্দিনেও এতটুকু কাহিল হইয়া পড়ে নাই—বরং ছোট-খাটো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাদের শুভ্র, সমুজ্জ্বল তাজমহল।

সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সর্ব্বগ্রাসী মিৎসুই বংশ। বেরণ হেকিরয়েমন মিৎসুই ইহার ডিরেক্টার। ইহা ছাড়া আরও দশটা বংশ ইহার অন্তর্গত। বংশানুক্রমিক ভাবে (১৮৭০ সন হইতে) ইহারা জাপানের বাণিজ্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। ৬০ কোটী ডলার বর্ত্তমানে ইহাদের (১৯৩১ সন) মূলধন। মিৎসুবিশী, সুমিটমো ইত্যাদি যে দুই তিনটী ধনকুবের বংশ আছে তাহাদের মূলধন ৫ কোটী ডলার (১৯৩১ সন)।

সম্প্রতি আফগান গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের খনিজ দ্রব্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারের জন্য বিদেশী কোম্পানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন এই মিৎসুই বংশ আমেরিকান কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। জাপানে পশম, গম ইত্যাদি যত আমদানী করা হয় তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী এই মিৎসুই বংশই করে। কয়লা, ময়দা ইত্যাদি যাহা রপ্তানি করা হয় তাহারও প্রায় অর্দ্ধেক ইহারাই করে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ইহাদের ৪০টা শাখা আছে। মিৎসুবিশী বংশের ডিরেক্টার বেরণ কয়াটা ইওয়াশাকী। গবর্ণমেণ্টর সঙ্গে ইহাদের বেশী সংযোগ। ইহারা সরকারী প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করে। ইহাদের অধীনে অনেক ব্যাঙ্ক আছে। বহু বীমা কোম্পানীও ইহাদের হাতে।

সুমিটমো বংশ ১০ কোটী ডলারেরও বেশী মূলধনের মালিক। ব্যাঙ্কিং এবং খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করাই ইহাদের প্রধান কাজ।

ইয়াসুদা বংশ সোজাসুজি জিনিষ উৎপাদন বা মাল আমদানী রপ্তানির কাজে বেশী হাত দেয় না। ব্যাঙ্কিং এবং মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া ইহারা অন্য কোন কাজ বড় একটা করে না। ইহাদের অধীনে যে ৪৪টী কোম্পানী আছে তার ১৮টীই ব্যাঙ্ক। ইহারা ৬টা বীমা কোম্পানীর মালিক। পরলোকগত জেঞ্জিরো ইয়াসুদা এই বংশের প্রতিষ্ঠা করে। মাল উৎপাদন বা আমদানী রপ্তানির দিকে তাহার ঝোক ছিল না—"একমাত্র ব্যাঙ্কিং" ইহাই ছিল তাহার জীবনের

মূলনীতি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া তাহারাও তাহাদের চিরাচরিত নীতি বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। কয়েকটা রেলওয়ে কোম্পানী, কাগজের কোম্পানী ইহাদের হাতে আসিয়াছে।

জাপানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে এই কয়েকটী ধনকুবের বংশের প্রভাব খুব বেশী। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি, তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, কোটী কোটী টাকার মূলধন সরবরাহ, এক কথায় শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রে তাহাদের একচ্ছত্র রাজত্ব জাপানকে আজ তুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পর জাপানে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্ত্তনের যুগ দেখা দিয়াছে। নিত্যনূতন শিল্পের ভিত্তি পত্তন, পুরাতন শিল্পকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন, হাতের পরিবর্ত্তে কলের ব্যবহার, ব্যাপক এবং বহুল পরিমাণে জিনিষ উৎপাদন—এই সব হইল এই যুগের বিশেষত্ব। আমরা এখানে কয়েকটী শিল্পের বিষয় আলোচনা করিব।

চীনামাটীর বাসন জাপানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। কাঁচা রেশম কিংবা কাপড় শিল্পের পরই ইহার স্থান। প্রতি বৎসর দেশ বিদেশে কোটী কোটী টাকার বাসন রপ্তানি করা হয়—রেশম বা কাপড়ের পরই এই শিল্পের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচ্য। গ্রেটব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসন নির্ম্মাতা। জাপান এই হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রতি বৎসর গড়ে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের বাসন সেখানে

তৈয়ারী হয়। এইরূপ দ্রুত উন্নতির কারণ কি? অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) কাঁচা মালের দিক দিয়া জাপান স্বাবলম্বী।

(খ) যে কোন প্রকারে বাসন তৈয়ারী করার মতো শিল্পী এবং কারিগর সেখানে আছে অসংখ্য।

(গ) মাল রপ্তানি করিবার সুযোগ এবং সুবিধা অন্যান্য দেশের চেয়ে জাপানের বেশী।

(ঘ) সেখানে কারিগর এবং মজুরদের বেতন খুব সস্তা।

(ঙ) দক্ষ শিল্পীরা সেখানে কাজ করে।

(চ) গত মহাযুদ্ধের পর জাপান পাশ্চাত্য জাতিদের নিকট হইতে শিখিয়া নিয়াছে, কি ভাবে কলকারখানার সাহায্যে বহুল পরিমাণে মাল উৎপাদন করা যায় এবং খুব দক্ষতার সহিত জাপান চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথার যোগসাধন করিতে পারিয়াছে।

নানারূপ কারুকার্য্যখচিত বাসন-পত্র এবং রংবেরঙের পাত্রাদি আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হয়। একমাত্র আমেরিকা খরিদ করে রপ্তানি দ্রব্যের অর্দ্ধেক।

এই শিল্পকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং মন্দার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি জাপানে "Japan Federated Ceramic Industry Association" নাম দিয়া এক শিল্পী-সমবায়-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেশে মাল উৎপাদন এবং বিদেশে মাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

মাছের ব্যবসায়ে জাপান দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়াছে। মাছের ব্যবসা সেখানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। খাস জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আশেপাশে অসংখ্য দ্বীপের উপকূল-ভাগ মাছ ধরিবার পক্ষে খুবই অনুকূল। জাপানের চারিদিকের সমুদ্রে প্রচুর এবং নানাজাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তিমি, সেমন (Salmon), স্বর্ণ-মাছ, কার্প ইত্যাদি নানাশ্রেণীর মাছ সেখানে আছে। কৃত্রিম পুকুরে স্বর্ণ-মাছের চাষ করা হয়। ১০।১২ রকম রংএর বিভিন্ন আকারের মাছ; ইহাদের সুন্দর লেজ এবং কাকনা—দেখিতে যেমন মনোহর, খাইতেও তেমন সুস্বাদু। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে রাশি রাশি স্বর্ণ-মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশীরা ইহাদের রং-এর বাহার এবং আকৃতির সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হয়।

বহু প্রাচীন যুগ হইতে মাছ ধরা এবং মাছের ব্যবসা জাপানে চলিয়া আসিতেছে—সেই মান্ধাতা আমলের নিয়মে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই ব্যবসাকে আরও ব্যাপক এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য ইদানীং খুব জোরে-শোরে চেষ্টা চলিতেছে।

এই ধনতান্ত্রিক যন্ত্রপাতির যুগে প্রাচীন পদ্ধতি আর যেন টিকিতে চায় না—তাই সেখানে কোটী কোটী টাকা মূলধন খাটাইয়া আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ছোট দরের ব্যবসায়ীও আছে প্রচুর। আধুনিক কলকারখানার সাহায্যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা হয়, এই মাছ বিদেশে রপ্তানি

হয়—ক্ষেতের সারও মাছ হইতে উৎপন্ন করা হয়। ১৯২৯ সনের হিসাবে দেখা যায়, সেখানে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক এক মাছের ব্যবসায়ে নিরত ছিল। এই বৎসরে ২৭০টী বিরাট কোম্পানী প্রায় ৮ কোটী ডলার মূলধন নিয়া এই ব্যবসা করিয়াছে। ২½ কোটী ডলার মূল্যের মাছ ঐ বৎসর ধরা পড়ে।

মাছ ধরিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাহা পাওয়া যায় তাহাও বাদ দেওয়া হয় না। কোরাল (Coral), মুক্তা, ঝিনুক, সামুদ্রিক আগাছা ইত্যাদি গভীর সমুদ্র হইতে সংগৃহীত হয়। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মুক্তা, আগাছা ইত্যাদি সংগৃহীত হয় তাহার মূল্যও কম নয়।

যদিও জাপান তুনিয়ার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৎস্য ব্যবসায়ী তবুও মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মাছ বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার কারণ কি? কারণ জাপানীরা প্রচুর মাছ খায় এবং ধৃত মাছের বেশীর ভাগই তাহাদের স্বদেশে আহার করা হয় বা কৃষির উন্নতির জন্য ক্ষেতের সার করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৯২৯ সনে একদিকে যদিও শতকরা ১০ ভাগ মাছ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল, আবার অন্যদিকে প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাছ এবং মৎস্যজাত অন্যান্য জিনিষ জাপানে আমদানি করা হইয়াছিল।

১৯২৯ সনে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মটর বোট মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। দিন দিন এই মটর বোটের আদর বাড়িতেছে আর সাধারণ নৌকা অদৃশ্য হইতেছে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য এই মটর বোটগুলি খুবই উপযোগী।
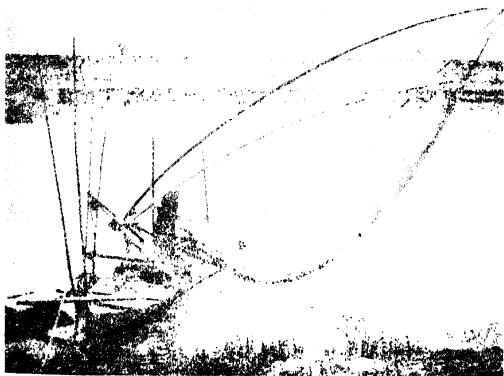
নিম্নে জাপানের কোন্ প্রদেশে মাছের এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জিনিষের ব্যবসা কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার আভাস দেওয়া হইল :—

মাঙ্গী—এখানে প্রচুর মাছের জাল তৈয়ারী হয়। এই সব জাল সোভিয়েট রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। মিকিমটো কোম্পানীর বিরাট মুক্তার কারবার আছে এইখানে। ইহা ছাড়া সামুদ্রিক আগাছা এবং ঝিনুক এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। ঝিনুক আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়। ওসাকা প্রদেশে সামুদ্রিক আগাছা হইতে জেলী তৈয়ারী হয়—এই জেলী জাপানে কিছু ব্যবহৃত হয় আর বাকী দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়।

নাগাসাকি—এখানে ১ কোটী ৮০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়। এই মাছ টীনে ভরিয়া বেলজিয়াম, শ্যাম, বৃটীশ সেটেল্‌মেণ্টস (সিঙ্গাপুর) প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। এখানে কচ্ছপের খোলা দিয়া খুব সুন্দর জিনিষ তৈয়ারী হয়।

শিজোওকা ও হকাইডো—মাছের কারবার এই দুই জায়গায় খুব উন্নত। এ জায়গার লবণ-দেওয়া এবং শুকনো মাছ চীন, মাঞ্চুয়াকু প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

মিয়াগী প্রদেশ—এখানে প্রায় ১½ কোটী ইয়েন মূল্যের সামুদ্রিক জিনিষ উৎপন্ন হয়।

ইয়োটী—এখানে ১ কোটী ১৩ লক্ষ ইয়েন মূল্যের শুকনো মাছ এবং হাঙ্গরের কাকনা উৎপন্ন হয়। এইগুলি বিভিন্ন প্রাচ্যদেশে রপ্তানি হয়।

বিওয়া হ্রদ—এই হ্রদে ৮০ প্রকারের স্বচ্ছ জলবাসী মাছ পাওয়া যায়। ট্রাউট (Trout) এবং সেমন (Salmon) মাছের চাষ করা হয় এই হ্রদে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেবল সামুদ্রিক মাছই জাপানে ধরা হয় না; হ্রদ এবং পুকুরেও মাছের চাষ হয়।

সাগা—এখানের ঝিনুক, Shell fish ইত্যাদি চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

বাঁশের শিল্প

প্রকৃতি জাপানকে প্রচুর বাঁশ দান করিয়াছে। নানাজাতীয় সুন্দর বাঁশ বিবিধ কাজে লাগানো হয়। কিয়োটোতে সব চেয়ে উত্তম বাঁশ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক এডিসন প্রথম যখন বৈদ্যুতিক বাতি তৈয়ারী করেন তখন বাতি ঝুলাইবার জন্য অতি সূক্ষ্ম সূতার মতো জিনিষ বাঁশ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। এরোপ্লেনের পাখা তৈয়ারী করিতে জাপানী বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

বাঁশের তৈয়ারী বাসনপত্র জাপানীদের বাড়ীতে ব্যবহার করা হয়। বাঁশের ডালা তন্মধ্যে অন্যতম। অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে এই ডালা জাপানে তৈয়ারী হইয়া আসিতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাঁশের ডালায় করিয়া মানুষ নদীও পার হইত। চা পানের আমোদজনক মজার অনুষ্ঠান জাপানে প্রচলিত হওয়ার পর হইতে বাঁশের ডালায় ফুল সাজাইবার রীতি সুরু হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে চীন হইতে এই সব সুন্দর ডালা আমদানী করা হইত। ১৭৩০ সনের পর হইতে অতি সূক্ষ্ম কাজ-করা ডালা জাপানে তৈয়ারী হইতে থাকে। কি সুন্দর ইহাদের কারিকুরী আর শিল্পনৈপুণ্য!

জাপানী কারিগরগণ বাঁশের কাজকে শিল্পীর চোখেই দেখে। বহু কারিকর বাঁশের সাহায্যে অতি চমৎকার মিহিন জিনিষ তৈয়ারী করে। এই সব জিনিষ তাহাদের শিল্পানুরাগ, সৌন্দর্য্য-বোধ এবং অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান কলকারখানার যুগেও বাঁশের জিনিষের মধ্যে কারিকরগণ তাহাদের হাতের দক্ষতা এবং ওস্তাদী দেখাইয়া দেশময় বিখ্যাত হয়। এই শিল্প এখনও যন্ত্রদানবের কবলগত হয় নাই। মানুষের মনের পরশ পাওয়া যায় এই বাঁশের শিল্পে। চিত্রের মধ্যে যেমন পাওয়া যায় চিত্রকরের খোঁজ, এই বাঁশের জিনিষের মধ্যে পাওয়া যায় তেমনি কারিকরকে—তার ব্যক্তিত্ব মূর্ত্ত হয় তার জিনিষের মধ্যে।

কিয়োটো প্রদেশে পাহাড়ের গায়ে, রাস্তার পাশে, ময়দানের আনাচে-কানাচে একরূপ নীল বাঁশ পাওয়া যায়। অতি মনোরম এই বাঁশ! স্বাভাবিক রং-এর বাঁশ, কৃত্রিম রং-দেওয়া বাঁশ, ঘরবাড়ীর পুরাতন বাঁশ—যাহা স্বভাবতঃই একটা মোলায়েম রং ধারণ করে ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বাঁশের ডালা, ফুলের সাজি এবং ফুলদানীতে। খুব ধারাল ছুরির সাহায্যে বাঁশের মোটা ত্বক তোলা হয়। ইহা দ্বারাই সব কাজ হয়। আনাড়ী কিংবা নূতন কারিকর এই ত্বক তুলিতে পারে না—এই বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে একজন কারিকরের ১৪ বৎসর সাধনা করিতে হয়।

ঘটা করিয়া চা পান জাপানের একটা সামাজিকতা। যে সে আবার চা তৈয়ারী করিতে পারে না—এর জন্য রীতিমত

দীর্ঘদিন 'বিদ্যা' অর্জ্জন করিতে হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সামনে ঘরের এদিক ওদিক বিশেষ যত্ন সহকারে বাঁশের ফুলদানীতে ফুল সাজানো হয়। ফুল সাজানো!—সেও আবার এক বিদ্যা।

জাপানে শিক্ষা

টকুগাওয়া শগোনাটি সামন্ত বংশের আমলে জাপানে একটা এলোমেলো এবং জটীল রীতিনীতিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল—ভিন্ন ভিন্ন সমাজিক স্তর একটা মস্ত বড় জগাখিচুড়ী পাকাইয়াছিল। সমাজের কোথাও ঐক্য বা সামঞ্জস্য ছিল না। সর্ব্বত্র একটা বিশৃঙ্খলা এবং বৈষম্যের ভাব বিরাজমান ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও তদ্রূপ বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছিল।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি মেইজী রাজবংশের পুনরুত্থানের পর প্রবর্ত্তিত হয়। দেশ ও সমাজকে পুনর্গঠিত করা, শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৈষম্য এবং উঁচুনীচু ভাব ঘুচাইয়া সর্ব্বত্র একটা ঐক্য এবং সমতা আনয়ন করা ছিল এই যুগের প্রধান চেষ্টা। তারই ফলে আজ জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটা ঐক্যরূপ, সুন্দর মিল এবং সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় অবস্থার বৈষম্যের কথা বিবেচনা না করিয়া সেখানে গ্রাম্য ছোটখাটো বিদ্যালয় আর সহরের বুকে অবস্থিত বৃহত্তর আকারের বিদ্যালয় একই আদর্শ ও ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়—মূলতঃ সকলের লক্ষ্য একই দিকে।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে জাপানীদের ঐকান্তিকতা এবং আগ্রহ। শিক্ষার লক্ষ্য হবে সাধারণের কোন না কোন উপকার সাধন; প্রয়োজনীয়তাবাদই (utilitarianism) হবে ইহার মূলমন্ত্র। জাপানীরা চাহিয়াছিল সহজ ও আরামদায়ক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে; সরকারী বা বে-সরকারী অফিসে, আদালতে বেতনভোগী চাকর সাজিতে। ঠিক এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে, যখন ইংরেজী শিখিয়া সরকারী বা সওদাগরী অফিসে নির্দ্দিষ্ট বেতনে একটা চাকুরী করাই ছিল এদেশের লোকের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এরূপ শিক্ষার বিষময় ফল জাপানীরাও ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বাধীন মনোভাব, জাগ্রত বুদ্ধি এইরূপ শিক্ষায় লোপ পায় তাই আজ জাপানীরা আবার তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আইন-কানুন সম্প্রতি আমেরিকান আদর্শে নূতন করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। আমেরিকান শিক্ষা-পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে জাপানের শিক্ষা-প্রণালীর উপর কাজ করিয়া আসিতেছে। ডাক্তার ডেভিড মারে নামক একজন মার্কিণ ভদ্রলোক প্রথমতঃ জাপানে সাধারণ স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি ১৮৭৫ হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত জাপানের শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শদাতা ছিলেন।

এস্থলে জাপানের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ৬ বৎসর বয়সে জাপানী ছেলেরা প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে যায়। ৮ বৎসর কাল বাধ্যতামূলক রীতিতে ইহারা শিক্ষালাভ করে। নব্য জাপানের প্রতিষ্ঠাতা মিকাদো মুৎসুহিতো বলিয়াছিলেন, "জাপানের নরনারী এমন ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে যাহাতে নিরক্ষর লোক জাপানে না থাকিতে পারে।" তাহার আশা হয়ত এখন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। যদিও ৮ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজিরা দেওয়া জাপানী ছেলেদের পক্ষে বাধ্যতামূলক তথাপি ইচ্ছা করিলে ৬ বৎসর কাল কোন এক সাধারণ গোছের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা অন্য চারিটী পথের যে কোন এক পথে চলিতে পারে :—(ক) তাহারা সোজা একেবারে বাস্তবজীবনের সঙ্গে মোকাবেলা করিবে অথবা (খ) উচ্চতর বিদ্যালয়ে আরও দুইবৎসর লেখাপড়া শিখিবে অথবা (গ) অন্য কোন উচ্চধরণের প্রাথমিক স্কুলে ২ বা ৩ বৎসর লেখাপড়া শিখিবে অথবা (ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়া ৪।৫ বৎসর লেখাপড়া শিখিবে।

সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈতিক উপদেশ, ভাষা, অঙ্ক, জাতীয় ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ড্রয়িং (চিত্রাঙ্কন), সঙ্গীত, শারীরিক কসরত এবং মেয়েদেরে একটা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে সেলাই শিখানো হয়। স্থানীয় অবস্থানুযায়ী হস্তশিল্পও শিখানো হয়। উচ্চধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীতি, ভাষা, অঙ্ক, জাতীয় ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, শিল্প-শিক্ষা, সঙ্গীত, শারীরিক কসরত এবং ব্যবসামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বালিকারা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সেলাই শিক্ষা করে। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি দরকার মনে হয় তবে

বিদেশী ভাষাও শিখানো যাইতে পারে। এই সব উচ্চশ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অনেকটা শিল্প-ব্যবসা মূলক।

১৯২৯-৩০ সনের হিসাবে দেখা যায় প্রায় এক কোটী ছেলে এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৯৯.৪৮ জন ছাত্র স্কুলে উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণতঃ উচ্চ-শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গেই সংযুক্ত। প্রথমোক্ত ১৮৩৪৮টী বিদ্যালয় এইভাবে সংযুক্ত এবং ১৫৭টী মাত্র আলাদা। যে সব সাধারণ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় সংযুক্ত নয় তাহাদের সংখ্যা ৭১২১। এই সকল উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ২ বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ বৎসর ৭৬৬৩৮৮ জন বালক এবং ৪৭৭০২৬ জন বালিকা লেখাপড়া শিখিয়াছে।

জাপানে তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুল আছে—(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয় (খ) মেয়েদের উচ্চবিদ্যালয় এবং (গ) শিল্প ব্যবসা শিক্ষার বিদ্যালয়। সাধারণতঃ যে সব ছেলেমেয়েরা ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক এবং যাহারা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহারাই এইসব বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ বৎসরের কোস শিখানো হয়। মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ কিংবা ৬ বৎসরের কোর্স এবং শিল্প-ব্যবসা শিক্ষার বিদ্যালয়ে ৩ হইতে ৫ বৎসরের কোর্স শিখানো হয়—কোন কোন বিদ্যালয়ে দুই বৎসরের কোর্সও আছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেমন নাগরিকগণকে সাধারণ কৃষ্টিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয় এইসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও তদ্রূপ কৃষ্টিমূলক সাধারণ ধরণের শিক্ষাই দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়ে কেবল ছেলেরাই পড়ে; ছেলেমেয়েকে একত্র লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা এখানে নাই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নীতি, প্রাথমিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, জাপানী এবং চীনা ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অন্যান্য বিদেশী ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ব্যবসা-শিক্ষা, চিত্র এবং ছবি অঙ্কন, সঙ্গীত, শিল্পবিদ্যা এবং শারীরিক কসরত শিখানো হয়। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী কিংবা তদূর্দ্ধ শ্রেণীর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত দুই প্রকারের যে কোন একটী পাঠ্য-সূচী অনুসরণ করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে, যথা—প্রাদেশিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শারীরিক কসরত ইত্যাদি বিষয় উভয় পাঠ্যসূচীতেই আছে। এইগুলিকে বলা হয় প্রধান বা মূল বিষয়। ইহাছাড়া কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় আছে, যথা—বিদেশী ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, সঙ্গীত, চিত্র এবং ছবি অঙ্কন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। ইহাদের যে কোন কয়েকটী বিষয় অতিরিক্ত ভাবে পড়িতে হয়। যেখানে একই বিষয় 'মূল' এবং 'অতিরিক্ত' হিসাবে নির্ব্বাচিত হয় সেখানে যথারীতি বিষয়ের তারতম্য করা হয়; মূলে কতক অংশ এবং অতিরিক্তের মধ্যে আর কতক অংশ রাখা হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, যথা—সরকারী ২, মিউনিসিপ্যাল

বা ঐ জাতীয় ৪৩৪ এবং বে-সরকারী (প্রাইভেট) ১১৯টী। সমস্তগুলি বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ৩৪৮,৩৮৬ জন।

ছাত্রীদের উচ্চ বিদ্যালয়

ছাত্রীদের উচ্চ বিদ্যালয়ের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছাত্র-বিদ্যালয়ের মতই। যাহারা গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে বিশিষ্ট কার্য্যকরী জ্ঞান লাভ করিতে চায় তাহাদিগের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে ঐ সব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে আরও উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় কিংবা 'পোষ্ট-গ্রেজুয়েট' বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট আছে। এই সব বিদ্যালয়ে ২ বা ৩ বৎসরের কোর্স পড়ানো হয়। প্রথমোক্ত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বালিকারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া থাকে এবং শেষোক্ত পোষ্ট-গ্রেজুয়েট বিদ্যালয়ে তাহারা এক বা ততোধিক বিষয়ে আরও গভীর ভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ পায়।

বালিকা বিদ্যালয়ে নীতি, জাতীয় ভাষা, বিদেশী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিত্র এবং ছবি অঙ্কন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সেলাই, সঙ্গীত এবং শারীরিক কসরত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদেশী ভাষা হয়তো পাঠ্যতালিকা হইতে বাদও দেওয়া যায় নয়তো ইচ্ছাধীন বিষয় হিসাবে পড়া যায়। স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া রাষ্ট্র বিজ্ঞান, হস্তশিল্প কিংবা ব্যবসা-শিক্ষা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের বাহিরে শিখানো হয়। দরকার মনে করিলে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমতি নিয়া অন্য কোন অতিরিক্ত বিষয়ও শিখানো যাইতে পারে।

বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা, যথা—সরকারী ২, মিউনিসিপ্যাল কিংবা ঐ জাতীয় ৫৩৮, বে-সরকারী (প্রাইভেট) ২১৭টী। ইহা ছাড়া ২১৩টী বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে হাতে-কলমে কাজ শিখানো হয়। সাধারণ শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা (১৯২৯-৩০) ৩৩১৬৬১, টেকনিকেল বিদ্যালয়ে ২৯৭৮৮, উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ১০১১ জন, পোষ্ট-গ্রেজুয়েট বিদ্যালয়ে ১০৭৪ জন এবং এই সব বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের বাহিরে যে সব সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়ানো হয় তাহা পড়ে মোট ৩৮১৭ জন।

ব্যবসা শিক্ষার বিদ্যালয়
(Vocational School)

যাহারা কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প কাজে হাত দিতে চায় তাহারা এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া দরকারী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জ্জন করে। কলকব্জা, কৃষি, ব্যবসা, নৌ-বিদ্যা এবং মৎস্যপালন শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুল আছে।

দুইজাতীয় স্কুল যথা—(১) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং (২) কলেজিয়েট শিক্ষা—প্রথম শ্রেণীর স্কুলগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত (ক) কতকগুলি স্কুলে ৫ বৎসরের কোর্স এবং (খ) কতকগুলিতে ৩ বৎসরের কোর্স। (ক) শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা— ৯২টী টেকনিকেল, ২৩০টী কৃষি বিষয়ক, ১৪টী মৎস্য পালন বিষয়ক, ২৫৭টী কমার্শিয়েল, ১১টী নৌ-বিদ্যালয় এবং ১৫৬টী বাণিজ্য এবং কারবার শিক্ষাবিষয়ক। বিভিন্ন প্রকার স্কুলে

যথাক্রমে (১৯২৯-৩০) ৩৯৩০৫, ৪৭১৭৩, ১৮২২, ১২৬৯৭৯, ২৪৪৩ এবং ৩৪৮০৯ ছাত্র আছে। (খ) শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা—২৭টী টেকনিকেল, ১০৯টী কৃষি, ৩৯টী কমার্শিয়েল, ১টী নৌ-বিদ্যালয় এবং ২১টী বাণিজ্যবিদ্যালয়—ইহাদের ছাত্র সংখ্যা (১৯২৯-৩০) যথাক্রমে ৪২২২, ১৮২৬২, ৯৬০৩, ১৩৬, ৫০৬০ জন।

উচ্চতর শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রেরা উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। এই সব বিদ্যালয় দুইশ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(ক) বিশিষ্ট জাতীয় বিদ্যালয় এবং (খ) বিশ্ববিদ্যালয়।

(ক) শ্রেণীর বিদ্যালয় আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কৃষ্টিমূলক বিদ্যাচর্চ্চা হয় এবং অন্য শ্রেণীতে টেকনিকেল বিদ্যা শিখানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহারা পায় তাহারা এই সব বিদ্যালয়ে ৩ বৎসরের কোর্স পাশ করিয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সও ৩ বৎসর স্থায়ী, কেবল ডাক্তারী শিক্ষার কোর্স ৪ বৎসর স্থায়ী হয়।

উচ্চতর বিদ্যালয়ের কলাবিভাগে নীতি, জাপানী এবং চীনা ভাষা, বিদেশী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক দর্শনশাস্ত্র এবং তর্কশাস্ত্র, আইন এবং অর্থনীতি, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং শারীরিক কসরত। আর বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানো হয় নীতি, জাপানী এবং চীনা ভাষা, বিদেশী ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব,

মনস্তত্ত্ব, আইন, অর্থনীতি, চিত্র ও ছবি অঙ্কন এবং শারীরিক কসরত। সেখানে ইংরেজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষাও শিখানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়

জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ের অংশমাত্র। ইহাদের বিভিন্ন শাখা বা বিভাগ আছে, যথা—আইন, ডাক্তারী, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, অর্থনীতি এবং কমার্স। প্রত্যেক বিভাগের একটা পোষ্ট-গ্রেজুয়েট শাখা আছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আছে। জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৪৬ এবং ইহাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০১৭১। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বৎসরের কোর্স পড়ানো হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাড়াও এই সব সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং বিশেষ কোন কোর্স পড়িবার জন্য (১৯২৯-৩০ সনে) ২৭৩৮৩ জন ছাত্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৫টি ইম্পেরিয়েল (রাজকীয়), ১২টী সরকারী (একটী বিষয় পড়ানো হয়), ৫টী মিউনিসিপ্যাল এবং ঐ জাতীয়, আর বাকী ২৪টী বে-সরকারী। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র একটী বিষয় পড়ানো হয় তাহাদের অধিকাংশই ডাক্তারী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষকদের বিদ্যালয় এবং কলেজ

শিক্ষকদের জন্য কতকগুলি ভিন্ন বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া সাধারণ শ্রেণীর স্কুলেও শিক্ষকদের ট্রেইনিং দিবার বন্দোবস্ত

আছে। নিম্নশ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলগুলিতে বিশেষ করিয়া প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগকে ট্রেইনিং দেওয়া হয়। উচ্চশ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ট্রেইনিং দেওয়া হয়। এই সব স্কুল সব সরকারী; কোন বে-সরকারী স্কুল সেখানে নাই।

নর্ম্মাল স্কুলের কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে ৫ বৎসরের কোর্স পড়ানো হয়। উচ্চতর শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহারাই এই কোর্স-পড়ে। আর দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুলের ৫ বৎসর কোর্স-পড়া ছাত্র ভর্ত্তি হয় এবং সেখানে ৫ বৎসরের ট্রেইনিং কোর্স পড়ে। নির্দ্দিষ্ট কোর্স ছাড়া এক বৎসরের অতিরিক্ত কোর্সও পড়ানো হয়, বিশেষ ট্রেইনিং হিসাবে।

প্রথম বিভাগে ছেলেরা নীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, জাপানী এবং চীনা ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ব্যবসামূলক শিক্ষা, চিত্র এবং ছবি অঙ্কন, হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা, সঙ্গীত এবং শারীরিক কসরত শিখিয়া থাকে। মেয়েরা এইসব ছাড়া অতিরিক্তভাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সেলাই শিখিয়া থাকে।

দ্বিতীয় বিভাগের ছেলেরা প্রায় এইসব বিষয়ই পড়িয়া থাকে, তবে তাহাদের ইংরেজী পড়িতে হয় না। জাপানে ১০৫টি নর্ম্মাল স্কুল (৫৯টি ছেলেদের জন্য এবং ৪৬টি মেয়েদের জন্য) আছে।

উচ্চতর শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুল

এই শ্রেণীর ৪টি স্কুল এখন এদেশে আছে, ২টি ছেলেদের এবং ২টি মেয়েদের। এইসব স্কুলে ৪ বৎসরের কোর্স পড়ানো হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে যাহারা পাশ করিয়াছে তাহারাই এইসব স্কুলে ভর্ত্তি হয়।

ছেলেদের জন্য যে সব স্কুল, তাহাদের আবার ২টা বিভাগ—একটা কলা বিভাগ এবং অন্যটা বিজ্ঞান বিভাগ। মেয়েদের স্কুলে ৩টা বিভাগ আছে—কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ এবং গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান বিভাগ। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান বিভাগে নীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সেলাই, হস্তশিল্প, হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা, বাগান করা, চিত্র এবং ছবি অঙ্কন, জাপানী এবং বিদেশী ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, সঙ্গীত এবং শারীরিক কসরত ইত্যাদি বিষয় শিখিতে হয়।

উচ্চতর ধরণের নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৮৫১ (পুরুষ) এবং ৮৪০ (মেয়ে)।

আমাদের দেশের নর্ম্মাল স্কুলের বা ট্রেইনিং কলেজগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এইসব স্কুল অনেকাংশে উন্নত ধরণের এবং বাস্তব সংসারের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ।

সামাজিক শিক্ষা

জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিশিষ্ট অঙ্গ সেখানের সামাজিক শিক্ষার বিধান এবং ব্যবস্থা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বাহিরেও অনেক ক্লাব, লাইব্রেরী, সমিতি, পাঠাগার ইত্যাদি আছে। দেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে ইহাদের শক্তি ও আয়োজন কম নয়। স্কুল কলেজে মাত্র বিদ্যা-শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর এই সব সমিতি, পাঠাগার, ক্লাব ইত্যাদিতে জ্ঞানের প্রদীপ আরও উজ্জ্বল এবং ব্যাপকভাবে জ্বালানো হয়।

সম্প্রতি জাপানে যুবকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যুবক ট্রেইনিং সমিতি, হাতে-কলমে কাজ শিখিবার জন্য বৃত্তিমূলক অতিরিক্ত ধরণের বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, প্রদর্শনী, পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পুস্তকাদি এবং অন্যান্য প্রকার পত্রিকাদি মঞ্জুর করার বোর্ড এবং এইসব দেখিবার জন্য একটা Bureau of Social Education স্থাপিত হইয়াছে। সরকারী শিক্ষা বিভাগের ইহা একটা অঙ্গ। যুবক যুবতীদের দ্বারা চালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ নৈতিক এবং সামাজিক কৃষ্টির দিকেই বিশেষ মন দেয়। পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা আছে এই সব প্রতিষ্ঠানে। পুরুষদের চালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫১৪৪ এবং মেয়েদের চালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩৩২২ (১৯২৯—৩০)। ১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক যুবকেরা Young Men's Training Instituteএ ট্রেইনিং পায়। এই সব প্রতিষ্ঠানের যুবকদেরে সাধারণতঃ শারীরিক এবং মানসিক নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দেওয়া হয়—নীতি, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, সাধারণ এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ইত্যাদিও বাদ দেওয়া হয় না। এই সব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শাসনাধীন।

জাপানে ১৫৭৮৭৫ এইরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল—(১৯২৯—৩০) সনে এবং তাহাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৮০৬৭৫৪।

সাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর সংখ্যা ৪৫০৩টী। ইহাদের ২৩টীর মধ্যে প্রত্যেকটীতে ৫০০০০ পুস্তক আছে, পাঠকের সংখ্যা ২২৮৩৫০০০। আর আমাদের বাংলা দেশে আছে কয়টী?

হাতে-কলমে বৃত্তি-মূলক শিক্ষা পাইবার জন্য যে সব কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে প্রাথমিক শিল্প-বিদ্যালয় হইতে পাশ-করা ছাত্রেরা আপন আপন শিল্প শিক্ষা করে। ইহা ছাড়া কি ভাবে খাঁটি নাগরিক হওয়া যায় তাহার জন্য ট্রেইনিং দেওয়া হয় এই সব কারখানায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার

১৮৭২ সনে যখন নব্য জাপানের শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা হয়, তখন কর্ত্তৃপক্ষ ঐ যুগের ফরাসী শিক্ষা-পদ্ধতিরই অনুকরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জাপানী পদ্ধতি খুবই গণতন্ত্রমূলক; দেশের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীর জন্য একই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা। অন্যান্য দেশের মতো জাপানেও বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ছাত্রগণের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়। এক যুগে হয়তো চরিত্র গঠন এবং উপযুক্ত নাগরিক তৈয়ারী করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে জাপান সে আদর্শ-চ্যুত হইতে চলিয়াছে। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হইল এখন চাকুরী করা। ঠিক অনেকটা আমাদের দেশেরই মতো।

গত মহাযুদ্ধের আমলে যখন জাপান ব্যবসায় বাণিজ্য-ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত বেকার সমস্যা বলিতে সেখানে কিছুই ছিল না। গত ১০।১৫ বৎসরের ভিতর এই বেকার রাক্ষসীর তাড়নায় জাপানী যুবক যুবতীর জীবনের সোনালী, মধুর স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সহজে চাকুরী পাওয়া জাপানী যুবকদের পক্ষে অতীতের স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। প্রতি বৎসর গড়ে ৩৫০০০ নরনারী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের শতকরা ৬০ জনই বেকার। ইহার কারণ কি? দুনিয়াজোড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা মন্দার ঢেউ উঠিয়াছে; তা'ছাড়া মনে হয় জাপানের ধন-তন্ত্রমূলক শিল্প-বাণিজ্য এখন উন্নতির একটা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। হয়তো এই capitalism-এর পতন আবার শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। কারণ প্রত্যেক অবস্থারই একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। জাপান আজ সে অবস্থায় উপনীত হইতে চলিয়াছে। জাপানে লেখাপড়ায় খরচ কম নয়—গড়ে একজন গ্রেজুয়েট তৈয়ারী করিতে ১০০০০ হাজার ইয়েন ব্যয় হয়। এত টাকা ব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী পাওয়া না গেলে অভিভাবকেরা স্বভাবতঃই ভাবে, সব টাকাই বুঝি জলে গেল।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া বর্ত্তমানে জাপানে শিক্ষাসংস্কারের জন্য একটা হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পার হইতে বহু বৎসর ব্যয় হয়—৬ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ৪।৫ বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ৩ বৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে, ৩।৪ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এইভাবে জীবনের ১৫।২০ বৎসর শিক্ষাক্ষেত্রেই ব্যয় হয়। এই দীর্ঘ সময়কে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য সেখানে একটা চেষ্টা চলিয়াছে। আবার এক্ষেত্রেও নানা মুনির নানা মত।

উচ্চতর ধরণের বিদ্যালয় মেয়েদের জন্য একটীও নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইলে ঐ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদেরে গ্রহণ করিতে চায় না। মেয়েদের জন্য খাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। হয়তো তাহাদের জন্য ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, নয়তো বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মেয়েদেরে গ্রহণ করিবে, ইহাই হইল মেয়েদের দাবী। এখনও কয়েকটা মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এইগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় না বলিয়া বিশিষ্ট শ্রেণীর স্কুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের দাবী ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া মানিতে মোটেই রাজী নয়। তাহারা বলে, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে বিবাহের পর সংসার-জীবনে ঢুকিয়া পড়ে, কাজেই তাহাদের উচ্চশিক্ষা ব্যর্থই হয়।

জাপানে বিজ্ঞান-চর্চ্চা

প্রাকৃতিক এবং ফলিত বিজ্ঞানে জাপান অন্যান্য অগ্রগামী উন্নতিশীল জাতির সমানে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার মাত্র এই ৭০।৭৫ বৎসরের মধ্যে জাপান বিজ্ঞান-জগতে এরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে যে সমগ্র সভ্য জগত আজ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য জাপানের রাজকীয় ৮টী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আরও অসংখ্য টেকনিকেল স্কুল বিদ্যমান। তাঁছাড়া সরকারী এবং বে-সরকারী বহু গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়—৫০টী সরকারী, ৩০টী বে-সরকারী এবং ১০টী মান-মন্দির আছে সেখানে। অনেক শিল্প-ব্যবসায়ী কোম্পানী তাহাদের নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাগার স্থাপন করিয়া আপন আপন শিল্পদ্রব্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। মান-মন্দিরে গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে নিত্য নূতন তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। জাপানের আকাশ বাতাস কিছুটা ঝাপসা বলিয়া মান-মন্দিরের কাজে একটু ব্যাঘাত ঘটে। তথাপি টোকিও মান-মন্দিরের জনৈক বৈজ্ঞানিক ১০টী নূতন গ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন এবং মিঃ নাকামুরা (কিয়টো বিশ্ববিদ্যালয়) নূতন গ্রহ—'Nakamura object' আবিষ্কার করিয়াছেন।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির তথ্যাদি ঠিক মতো সংগ্রহের জন্য ইদানীং জাপানে নানারূপ উন্নত

ধরণের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইয়াছে। জাপানে ভূমিকম্প প্রায় লাগিয়াই আছে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে কখন্ ভূমিকম্প হইবে—তাহা সঠিক ভাবে পূর্ব্বাহ্ণেই বলিয়া দেওয়া যায়। ১৯৩৪ সনে যখন বিহার প্রদেশে ভীষণ ভূমিকম্প হয় তখন জাপান হইতে কতিপয় ভূতত্ত্ববিদ, বিশেযজ্ঞ বৈজ্ঞানিক এদেশে আগমন করেন। তাঁহারা বিহারের ভূমিকম্প সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে জাপানের ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি বিষয়ক বিজ্ঞান যে অনেকাংশে উচ্চশ্রেণীর তাহাই জগতের সমক্ষে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৩৪ সনের ১৭ই অক্টোবর সাবমেরিনের সাহায্যে কতিপয় বৈজ্ঞানিক জাপান-সমুদ্রের তলদেশে গমন করিয়া সেখানের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। ভূমিকম্প কিংবা জোয়ার-ভাটা ইত্যাদির কারণ সম্বন্ধে তখন অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। World Physics Association-এর অনুরোধে সমুদ্রের তলদেশে এই অভিযান করা হয়। এই অভিযানের ফল জাপানের বৈজ্ঞানিকদের সুনাম আরও বাড়াইয়া দিবে।

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেখানে খুব আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণা চলিতেছে। জাপানে অনেক নূতন ধরণের জীবজন্তু ও গাছপালা আছে। ইহাদের সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য ইদানীং আবিষ্কৃত হইয়াছে। টহুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক (ডক্টর হাটাই) গুবরে পোকার জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা খুবই উপাদেয় এবং উল্লেখযোগ্য। প্রফেসার নাকাই (টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়), মিঃ আনেজাকী (কৃষি-গবেষণাগার)

ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ গাছপালা সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাপানী বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ নিত্য নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সেরূপ ফলিত বিজ্ঞানেও তাহাদের গবেষণার দ্রুত প্রসার এবং তাহার সুফল পাশ্চাত্য জগতকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। ব্যোমযান নির্ম্মাণ-কৌশলের দিক দিয়া জাপানীরা পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারদের সমকক্ষ।

বেতারবার্ত্তা, রেডিও ইত্যাদি সেখানে খুবই উন্নত। পর্ব্বত-বহুল জাপানে স্বভাবতঃই Short Wave Radio বেশী উপযোগী। বর্ত্তমানে ১৭টী বেতার ষ্টেশন আছে সে দেশে; তাহাদের শ্রোতার সংখ্যা ৮ লক্ষেরও বেশী। জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে রেডিও সংবাদ আদান প্রদানের জন্য সম্প্রতি জাপানে একটা বার্ত্তা-প্রেরক ষ্টেশন এবং একটা বার্ত্তা-গ্রাহক ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া Television, বৈদ্যুতিক উপায়ে দূরে ফটোগ্রাফ প্রেরণ ইত্যাদির সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে; নূতন ধরণের বেতার-বার্ত্তা বহনকারী ও গ্রহণকারী কলকব্জার আবিষ্কার করা হইয়াছে। Television-এর আরও উন্নতি এবং প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে Japan Television Association নামে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

Japan International Telephone Company ইদানীং ফরাসী, হল্যাণ্ড, ইতালী, শ্যাম, আর্জ্জেনটাইন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে টেলিফোন বার্ত্তা আদান প্রদানের ব্যবস্থা

করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, আমেরিকা (U. S. A.), কানাডা, বার্লিন, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে বার্ত্তা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাপানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির আর একটী উজ্জ্বল নিদর্শন টান্না টানেল (Tanna Tunnel)। গত ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে এই টানেলের ভিতর দিয়া প্রথম গাড়ী চলাচল করে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহার কাজ আরম্ভ করা হয় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখা গেল ব্যাপার মোটেই সোজা নয়। এই টানেল তৈয়ারী করিবার সময় নানারূপ দুর্ঘটনায় ৬০ জন লোক মারা গিয়াছে। শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাপানী ইঞ্জিনিয়ার পাথরের দুর্গ ভেদ করিয়াছেন এবং তাহার খরচ পড়িয়াছে ২½ কোটী ইয়েন। সুইজার্লেণ্ডের সিম্পলন্ (Simplon Tunnel) টানেল তৈয়ারী করাও খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল কিন্তু এই টান্না টানেলও নানা কারণে দুনিয়ার দুঃসাধ্য কাজের অন্যতম।

মিঃ ওকাডা একরূপ নূতন ধরণের ইঞ্জিন আবিষ্কার করিয়াছেন—তরল বাতাস বাষ্পে পরিণত এবং প্রসারিত হয় আর ইঞ্জিন চলিতে থাকে। এই শীতল বাতাস আবার তরল আকারে পরিণত করা যায় এবং পুনরায় বাষ্পে পরিণত করিয়া ইঞ্জিন চালান যায়। এই ভাবে একই বাতাস বার বার কাজে লাগে। পরীক্ষা এবং গবেষণার স্তর পার হইয়া শীঘ্রই মিঃ ওকাডার নূতন আবিষ্কার মোটর জগতে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে। এই ইঞ্জিনকে বলা হয় Super air-cooled engine.

মিঃ ফকুহারা সম্প্রতি ক্যামেরার খুব উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কোন জিনিষের অতি সূক্ষ্ম এবং দ্রুতগতির ছবি উঠিবে তাহার আবিষ্কৃত ক্যামেরায়; যথা—ঘণ্টাধ্বনির শব্দ-তরঙ্গ, টাইপ মেশিনের সঞ্চালন; কাচ চূর্ণ করার মতো অতি দ্রুতগামী ব্যাপার, এই সব ধরা পড়িবে তাহার ক্যামেরায়! প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০ ছবি তোলা যায়, তিনি এরূপ একটা ক্যামেরা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

ডাক্তার ইয়াণ্ডর ছাগলের রক্ত হইতে একপ্রকার বসন্তের টিকার বীজ তৈয়ার করিয়াছেন। ১৯৩৪ সনের নবেম্বর মাসে যখন কুমামটো প্রদেশে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয় তখন ডাক্তার ওটা তাহার নিজের তৈয়ারী বীজ দিয়া ১০৭ জন রোগীকে ইনজেকসন্ দেন। সবই বাঁচিয়া গেল এবং তাহাদের মুখে একটীও বসন্তের দাগ ছিল না।

জাপানে গবেষণাগার অনেক। কতকগুলি কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কয়েকটীর নাম নিম্নে দেওয়া গেল, যথা:—

The Oceanic Fishery, Chemical Research Institute, The Cancer Research Institute, The Seismological Institute, The Tropical Biology Research Institute, The Mitsui Oceanic Biological Research Institute ইত্যাদি।

জাপানী সংবাদ-পত্র

জাপানের বিখ্যাত সংবাদ-পত্র 'আসাহী' ১৮৭৯ সনের ২৫শা জানুয়ারী প্রথম যাত্রা সুরু করে। 'আসাহী' অর্থ প্রাতঃসূর্য্য, প্রাতঃসূর্য্যেরই মতো ইহা গত ৬০ বৎসর যাবৎ জাপানের অলিগলি ও আঁধার ঘরের কোণে জ্ঞানের আলো বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর 'আসাহী' তাহার জয়যাত্রাকে সফলতর ও ব্যাপকতর করিয়া তুলিয়াছে। আজ সারা তুনিয়ায় 'আসাহী' দৈনিক সংবাদ-পত্র জগতে সম্মান-জনক আসন লাভ করিয়াছে। মিঃ মুরায়ামা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ওসাকায় এই দৈনিক পত্রের ভিত্তি পত্তন করেন। 'আসাহীর' বাল্যজীবন খুব সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল না, কারণ তখন মাত্র ৭৮ হাজার পত্রিকা কাটতি হইত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে টোকিয়োর 'মোজামাশী' দৈনিক পত্র তিনি খরিদ করেন এবং ইহার নূতন নামকরণ করা হয় 'টোকিয়ো আসাহী'। টোকিয়ো সহরে তখন 'আসাহীর' আরও ১৮টী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মিঃ মুরায়ামা তাহার দূরদর্শীতা, সুপরিচালনা এবং ব্যবসায় বুদ্ধির জোরে সকল প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলিয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসাহীর গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপার, ছোট গল্প, দৈনন্দিন ঘটনাবলী ইত্যাদি সব কিছুই স্থান পাইত এই পত্রিকায়। জাপান তথা সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করাই হইল মূলতঃ এই পত্রিকা পরিচালকের অন্যতম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য।

নিছক ব্যবসায়বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 'আসাহীর' দ্রুত উন্নতির মূলে রহিয়াছে পরিচালকের এইরূপ সাধু উদ্দেশ্য।

১৮৯০ সনে রোটারী প্রেসে 'ওসাকা আসাহী' ছাপান আরম্ভ হয়। অন্য কোন পত্রিকা তখনও রোটারী প্রেস ব্যবহার করে নাই। ১৮৯৪-৯৫ সনে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 'আসাহী' তখন জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের টাটকা খবর জারী করিয়া প্রকৃত জনসেবার কাজ করিয়াছিল। জাতি-গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি কতটুকু, জনসাধারণ তখন 'আসাহী' পড়িয়া তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। 'ওসাকা মাইনিচী' তখন আসাহীর ভীষণ ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মিঃ মুরায়ামা 'আসাহীর' কাগজ আরও ভাল করিলেন এবং তাহার ফলে এই অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী কাবু হইয়া পড়িল।

১৯০৪ সনে রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই 'আসাহী' পত্রিকা আবার জনসেবার জ্বলন্ত আদর্শ জাতির সামনে দাঁড় করাইল। 'আসাহী' তখন আর ছোট দৈনিক পত্রিকা বিশেষ নয়—কোটী কোটী টাকা মূলধন নিয়া পরিচালকেরা কাজে নামিয়াছে; সংবাদ সংগ্রহ, প্রবন্ধের সমাবেশ ইত্যাদি নানা দিক দিয়া 'আসাহী' তখন জাপানের উৎকৃষ্ট দৈনিক পত্রিকা। এই যুদ্ধের দৈনন্দিন সংবাদ নেওয়ার জন্য 'আসাহীর' বিশিষ্ট সংবাদ-দাতারা যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে।

আসাহী পাব্‌লিশিং কোঃ একটা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। ১৯৩১ সনে ইহার মূলধন ছিল ৬০ লক্ষ ইয়েন এবং ওসাকা ও

টোকিয়ো এই দুই জায়গায় যত লোক 'আসাহী' অফিসে কাজ করিত তাহাদের সংখ্যা ছিল ৩৭৯৫।

বর্ত্তমান সময় "ওসাকা আসাহীর" গ্রাহক সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশী। ওসাকা, টোকিয়ো এবং মজী সহরে এখন দৈনিক দুইবার—সকালে এবং বিকালে—পত্রিকা বাহির কর হয়। ওসাকা এবং টোকিয়োর 'আসাহীর' প্রাতে আটটী এবং বিকালে তিনটী সংস্করণ বাহির হয়। আর মোজী অফিস হইতে প্রাতে তিনটী ও বিকালে তিনটী সংস্করণ বাহির হয়। দৈনিক পত্রিকা ছাড়া আসাহী কোম্পানী আরও বহু পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করে, যথা—The Weekly Asahi, Asahi Graph, Asahi Sports (bimonthly), Asahi Camera, Screen and Stage, Women and Children's Asahi, The Osaka and The Tokiyo Library Editions (monthly), The Asahi Year Book, The Athletic Almanac, The Asahi Economic Almanac, Japan in Picture (monthly), Japan Photograph Annual, The Asahi Year Book for Fine Arts, The Present Day Nippon (English Supplement of Asahi Yearly) ইত্যাদি নানা প্রকার পত্রিকা ও পুস্তকাদি আসাহী কোম্পানী প্রকাশ করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে সংবাদ দ্রুত সরবরাহ করার জন্য সম্প্রতি মোজী ও কোবে সহরে 'আসাহী'র নূতন অফিস খোলা হইয়াছে। মূল 'আসাহী' পত্রিকার সঙ্গে

স্থানীয় সংবাদবাহী অন্যান্য অতিরিক্ত পত্রিকা একই সঙ্গে পাঠকগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

'আসাহীর' জীবনের মূলমন্ত্র সততা, দ্রুত সংবাদ সরবরাহ, ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নীতি। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'আসাহী' আজ জাপানের অলিগলি এবং পৃথিবীর অন্যান্য নানাস্থানে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'আসাহীর' অংশীদারগণ সকলেই এই পত্রিকার কোন না কোন বিভাগে কাজ করে; বাহিরের লোক কেহই অংশীদার নাই। এই দিক দিয়া 'আসাহী' পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। জাপানে অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য যেরূপ কোন এক বংশের—যেমন মিৎসুই, মিৎসুবিশী, ইয়াসুদা ইত্যাদির একচেটিয়া দখলে; এই 'আসাহী' সংবাদ-পত্রও ঠিক সেইরূপ একই বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'আসাহীর' সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোক উহার অংশীদার, সংবাদদাতা, পরিচালক-সমিতি, চাকুরিয়া—যেন সকলে একই বংশ বা পরিবারভুক্ত।

দুনিয়ার সব জায়গায় 'আসাহীর' সংবাদদাতা আছে—লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, মস্কো, কলিকাতা ইত্যাদি ৫০টা সহরে।

ওসাকা ও টোকিয়োর দূরত্ব ৫৭০ কিলোমিটার। মাটির নীচে সুরঙ্গ পথে দুই 'আসাহী' অফিসের মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। 'আসাহীর' সব অফিসে টেলিফটো যন্ত্র রহিয়াছে, ইহার সাহায্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে ফটো আদান প্রদান করা হয় বিভিন্ন অফিসে। ইহা ছাড়া আসাহী কোম্পানীর ১৮ খানা এরোপ্লেন

আছে। সংবাদ আদান প্রদান, পত্রিকার নিজস্ব লোকজন একস্থান বা এক অফিস হইতে অন্য স্থান বা অন্য অফিসে বহন করা ইহাদের কাজ। কোন কোন এরোপ্লেনে বেতার যন্ত্র আছে। জাপানী আরও দুই একটী পত্রিকার নিজস্ব এরোপ্লেন আছে কিন্তু কোন এরোপ্লেনে বেতার যন্ত্র নাই। ইহা ছাড়া ওসাকা, টোকিয়ো এবং মোজী অফিসে ৩০০ শতেরও বেশী সংবাদবাহী পারাবত রাখা হয়। যদি কোন কারণে এরোপ্লেন চলাচল বিপজ্জনক হইয়া পড়ে তখন এই সব পারাবত এরোপ্লেনের কাজ করে।

১৯১৫ সনে ওসাকা, টোকিয়ো এবং মোজী হইতে প্রকাশিত 'আসাহীর' গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষেরও বেশী, আর বিভিন্ন স্থানে 'আসাহীর' বিক্রেতা এজেন্টের সংখ্যা ছিল ৫০০০।

সংবাদ প্রকাশ করাই 'আসাহীর' একমাত্র কাজ নয়। ৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৯ সনে 'আসাহী' কোম্পানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন কল্পে একটা পুরস্কার ঘোষণা করে—গোলাকৃতি নিকেলের তৈরী জাপানী আয়না এবং ঐ সঙ্গে নগদ এক হাজার ইয়েন। যাহারা বিজ্ঞান, আর্ট এবং সাহিত্য, খেলাধূলা কিংবা সাধারণভাবে জাপানের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও এই পুরস্কার প্রতি বৎসর দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তরুণদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রতি বৎসর প্রাইমারী স্কুলের ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা খুব সূক্ষ্ম বিবেচনার পর পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছেলে-মেয়েদের লিষ্ট তৈয়ারী করেন।

'আসাহী' অফিসের সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে অডিটরিয়াম এবং প্রদর্শনীগৃহ। 'আসাহীর' উদ্যোগে সময় সময় নানা প্রকার বক্তৃতা-সভা, কনসার্ট, শিক্ষাবিষয়ক ফিল্ম ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীগৃহে নানা জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়া থাকে, অনেক পাশ্চাত্য নর্ত্তক নর্ত্তকী এবং গায়ক গায়িকা এই সব অডিটরিয়ামে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

পনর বৎসর পূর্ব্বে—১৯২৫ সনে-'আসাহী' পরিচালকদের চেষ্টায় পশ্চিম জাপান ও পূর্ব্ব জাপানে দুইটী Federation of Women's Societies-এর ভিত্তি পত্তন হয়। জাপানী নারী ও শিশুদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের জন্য এই দুইটী সমিতি অনেক কাজ করিয়াছে। জাপানের Federation of Photographic Societies-এর যাত্রা সুরু হয় এই 'আসাহীর' কল্যাণে। জাপানে অনেকবার জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে এই সমিতির চেষ্টায়।

বহুবৎসর পূর্ব্বে Asahi Social Welfare Society স্থাপিত হয়। সমাজ সেবার কাজে যে সব সমিতি আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই 'আসাহী' সমিতি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে ইহার মহৎ সেবার আদর্শের জন্য। 'আসাহী' এই সমিতিকে ১০ লক্ষ ইয়েনের একটা Endowment করিয়া দিয়াছে। শিশু-রক্ষা, শিশু-সেবা, ইহাদের যত্ন, ভ্রাম্যমাণ শিশু-নার্সারী পরিচালন, জাপানের অন্যান্য নার্সারীকে নানা ভাবে সাহায্য করা, যুবকদিগকে শিল্প-শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য দান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে যাহারা বিপন্ন

হয় তাহাদিগের দুঃখ-মোচন ইত্যাদি নানাবিধ সৎকাজ করিয়া থাকে এই 'আসাহী'। বৎসরান্তে একটা "সাহায্য-সেবা সপ্তাহ" ঘোষণা করা হয়। ঐ সময় 'আসাহীর' অডিটরিয়ামের দ্বার নানা প্রকার অভিনয়ের জন্য খোলা হয় এবং আর্ট-প্রদর্শনী, ফিল্ম কনসার্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই সব আয়োজনে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা আর্ত্ত জনের সেবায় ব্যয়িত হয়।

জাপানে এরোপ্লেনে আকাশ-বিহারের (aviation) বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার জন্য দায়ী এই 'আসাহী।' ১৯১১ সনে যখন জাপানে এরোপ্লেনে উড়ার বাতিক মোটেই ছিল না তখন এই 'আসাহী' আমেরিকা হইতে জনৈক 'মানুষ পাখীকে' (man bird) নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া জাপানে আকাশ-বিহারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

১৯২৪ সনে 'আসাহীর' এরোপ্লেন সর্ব্বপ্রথম ওসাকা ও টোকিয়ো এবং টোকিয়ো ও সেণ্ডাই এর মধ্যে যাত্রী নিয়া যাতায়াত আরম্ভ করে। ১৯২৫ সনে 'আসাহী' দুইটা এরোপ্লেন সাইবেরিয়ার পথে লণ্ডন এবং রোমে পাঠায়। সুদূর প্রাচ্য হইতে ইতঃপূর্ব্বে আর কোন এরোপ্লেন য়ুরোপে যায় নাই। ১৯৩১ সনে 'আসাহী' প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিবার জন্য জনৈক জাপানী বৈমানিককে এক লক্ষ ইয়েন এবং অন্য একজন বিদেশী বৈমানিককে ৫০ হাজার ইয়েন পুরস্কার দেয়। ১৯৩৪ সনে জাপানের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-বৈমানিকদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। 'আসাহী' এর চেষ্টায় সংবাদ-পত্র পরিচালনার কাজের সুবিধার জন্য জাপানে 'আসাহী' সর্ব্বপ্রথম

এরোপ্লেন নিযুক্ত করে। অন্য কোন দেশে সংবাদপত্র আকাশ-বিহারের উন্নতির জন্য এত ব্যাপক চেষ্টা করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

শরীর-চর্চ্চা ক্ষেত্রেও 'আসাহীর' দান কম নয়। বিদেশ হইতে খেলোয়াড় আমদানী করিয়া 'আসাহী' জাপানে উচ্চাঙ্গের খেলাধূলার আয়োজন করিয়া দেশবাসীদের সামনে একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। 'আসাহীর' চেষ্টায় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। 'যুযুৎ-সু' জাপানের অন্যতম বিশিষ্ট ধরণের শরীর-চর্চ্চা কৌশল। প্রতি বৎসর 'আসাহী' টোকিয়ো সহরে All Japan Jujutsu Championship-এর আয়োজন করে।

১৯২৩ সনের ভূমিকম্পে ও অগ্নি-সংযোগে যখন টোকিয়ো এবং ইয়োকোহামা ধ্বংস হইয়া যায়, লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে যখন বিষাদের কালিমা লিপ্ত হয়, তখন 'আসাহী' সমগ্র জগতের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের চেষ্টা করে এই সব বিপন্ন নর-নারীর জন্য। আর দেশ-বিদেশ হইতে দান গ্রহণ করিয়া আর্ত্ত বিপন্ন জনসাধারণকে সাহায্য করা হয়। ১৯৩৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম জাপান যখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত এবং ভীষণ জল-প্লাবনে ভাসিয়া যায় তখন এই 'আসাহী' অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থ জন-মণ্ডলীকে সাহায্য করে। একমাসের মধ্যে একলক্ষ ৪০ হাজার ইয়েন সংগৃহীত হয়। ঐ বৎসরই ২।৩ মাস পর যখন আবার উত্তর পূর্ব্ব জাপানে শস্য-হানি ঘটে এবং লোকজন অন্নাভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিল তখন 'আসাহী' দুই মাসের

মধ্যে ৩ লক্ষ ইয়েন সংগ্রহ করিয়া নিরন্ন জনসাধারণের অন্নের যোগাড় করিয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমাদের স্বদেশের, তথা বাংলার কথা। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, জল প্লাবন, শস্যহানি তো এই দুর্ভাগা দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া বিপন্নের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে হাত দিয়াছেন কি?

জাপানী সাহিত্য

বর্ত্তমান সময় জাপানী সাহিত্য একটা পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। এ একটা গঠনের যুগ—সাহিত্যক্ষেত্রে নানা চিন্তা-মার্গের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন সাহিত্য-চক্র বা সম্প্রদায়ের আবার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকও আছে; থাকাইতো স্বাভাবিক। বিগত ১৯২৩ সনের ভূমিকম্প জাপানের যেরূপ ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে এবং তাহার ফলে আজ যেরূপ টোকিয়ো প্রভৃতি সহর পুনর্গঠিত হইয়া নূতন বেশে জগতের সামনে আত্মপরিচয় দিতেছে সেরূপ জাপানী সাহিত্যও এই ভীষণ ভূমি-কম্পের পর পুরাতনকে বিদায় করিয়া নূতন পন্থাবলম্বী হইয়াছে। পূর্ব্বের নামজাদা সাহিত্যিক আজ নিজের সম্মানজনক আসন হইতে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁরা ছিলেন তখন সাহিত্য-জগতে ষ্টার (star), যাঁহাদের পাঠক ছিল লাখে লাখে, তাঁহারাই আজ পিছনে পড়িয়াছেন। অতি অল্প সংখ্যক পাঠকই এখন তাঁহাদের বইয়ের সমাদর করে।

পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক সাহিত্য বিশেষ করিয়া রুশ সাহিত্য যেরূপ সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের জীবনের ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে—জাপানী সাহিত্যেও সেরূপ একটা চেষ্টা চলিয়াছে। সমাজের যারা ব্যথিত, বঞ্চিত, হতাদর তাহা-দিগকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা জাপানে জোরে সুরু

হইয়াছে। সাহিত্যে আভিজাত্যের যুগ আর নাই। নিছক ভাব-বিলাসিতা, কল্পনা-প্রবণতা, রাজা রাজরার জীবনের কাহিনী, ঐশ্বর্য্য এবং সমাজের ফেনায়িত বৃহদাকারের ছবি এ যুগে হয়ত আর চলিতে চায় না। অনেকেই আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে নিঃস্ব, অনাদৃত ব্যক্তিই সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ফলে তাহাদের সাহিত্যও যে এক গৌরবান্বিত আসন দখল করিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? জাপানে সাহিত্যের যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ দরিদ্র দরদী (Proletarian)। জাপানের মজুর এবং কৃষককুল কারখানা বা ফারমের সাহিত্য-আসরের মারফৎ এত ব্যাপক এবং ব্যাকুল ভাবে এই গরীবের সাহিত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে যে কেবল মাত্র জার্ম্মানী ছাড়া অন্যান্য দেশ যথা,—আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্সকে জাপান ইতিমধ্যেই অনেক দূর পিছনে ফেলিয়াছে। মার্কস্ এর মতবাদ কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্বন্ধে জার্ম্মানীতে যত বই প্রকাশিত হইয়াছে তার চেয়ে বেশী হইয়াছে এই জাপানে। ১৯২১ সনে এই আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৯২৫ সনে Nippon Proletarian Artists' Federation (N. P. A. F.) স্থাপিত হয়। পরে এই সমিতির আরও রদবদল হয়। "Worker and peasant Artists' Federation" নামে অন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এদের বহু শাখা প্রশাখা আছে। স্থূল উদ্দেশ্য প্রায় সকলেরই এক, যদিও কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য আছে। চকু টকুনাগা, টাকিজা কবায়াশী প্রভৃতি লেখকগণ N. A. P. F. পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। ইহাদের প্রকাশিত অনেক বই আছে। মিস্

ইউরিকো চুজো (Yuriko Chujo) একজন শক্তিশালী লেখিকা। সম্প্রতি তিনি সোভিয়েট রাশিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি খুব সহজ, সঠিক এবং দৃঢ়ভাবে নানারূপ গল্প লিখিয়া থাকেন। চকু টকুনাগার লিখিত "The street without the sun" পুস্তকখানা "Die Strasse ohne sone" নাম দিয়া জার্ম্মান ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। টামিকি হসোডা লিখিত "Spring of the truth" পুস্তকখানা ধনিক সম্প্রদায়ের কাণ্ড কারখানার এক অতি উপাদেয় এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। সম্প্রতি প্রলেটেরিয়ান লেখকগণ কৃষক সমাজ এবং ধর্ম্ম-বিরোধী আন্দোলনকে বিষয় বস্তু করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেছেন।

প্রলেটেরিয়ান দলের বাহিরে যাঁহারা সাহিত্য সাধনা করিতেছেন তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা,—বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী—মাটীর সংসার ও বাস্তব জীবনধারা হইতে যারা দূরে সরিয়া থাকিতে চান। "Before the break of day" নামক বইখানা টসন সিমাজাকী প্রাচীন জাপানী জীবনকে কেন্দ্র করিয়া লিখিয়াছেন। জুলিকরো টানিজাকী 'A fylfot' নামক একখানা বই লিখিয়াছেন; অস্বাভাবিক যৌনবোধ-সম্পন্ন মানব ও মানবীর জীবনলীলা ইহার বিষয় বস্তু। ইহা ছাড়া "A cafe girl," "The brothers Aujo," এবং "Tramps of the street" ইত্যাদি পুস্তক সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনধারার বাস্তব ছবি। ইউরিণ গেজী, টয়োহিকোকুমু, মাসাটস্নে নাকামোরা শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক—ইহারা প্রধানতঃ

'Art for art's sake' এই মতাবলম্বী জাতীয় লেখক। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রূপ মেজাজের উপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়া ইহারা বাস্তব জীবনের অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে সাংবাদিক সাহিত্যের দিকে জাপানী লেখক ও পাঠকদের খুব ঝোঁক দেখা যায়। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত গল্পের খুব আদর কারণ Truth is stranger than fiction। গত ১৯২৩ সনের ভূমিকম্পের পর হইতে জাপানে 'জনপ্রিয় সাহিত্য' নামক এক শ্রেণীর সাহিত্য খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা আমোদজনক এবং তরল সাহিত্য। ইতিহাসের গল্পের উপর কল্পনার রং ফলাইয়া খুব সহজ ও লোকপ্রিয় ভাষায় এই সাহিত্য রচনা করা হয়। আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে মিল রাখিয়া একদল লেখেন এবং অন্যদল এই ভাবধারার প্রতি সামান্যই দৃষ্টি দেন।

চন্দ্র মল্লিকা, চেরীর দেশ জাপান। সৌন্দর্য্যের ঢেউ উঠিয়াছে চারিদিকে। জাপানী মন স্বতঃই কবিতানুরাগী। জাপানীরা অনেকেই কবিতা লেখে ও ছবি আঁকে। তাহাদের কবিতায় শব্দের ঝঙ্কার, ছন্দের নৃত্য, ষ্টাইলের বাহাদুরী নাই— আছে ইঙ্গিত। দু'এক কথায়, নিতান্ত সহজ ও সোজাভাবে অতি সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দেখা যায় এই সব কবিতায় যথা,—

ব্যাঙ নড়ে
পাতা পড়ে

অথবা

পচা পুকুর

ব্যাঙের লাফ

বাস্! হইয়া গেল কবিতা। কবিতা নয় যেন ছবির মধ্যে তুলির আঁচড়। এই সব কবিতা চোখ দিয়া পড়িতে হয় না, মন দিয়া দেখিতে হয়। কতগুলি অক্ষর পাশাপাশি সাজাইলেই জাপানী কবিতা হয়। জাপানের শ্রেষ্ঠ কবি ইয়নো নগোচি। তিনি দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। আমেরিকার কবি মিলারের সংস্পর্শে আসিয়া কবি নগোচি প্রথম ইংরেজী শিখেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'Seen unseen' আমেরিকাবাসিগণকে তাক লাগাইয়া দেয়।

জাপানী নারী

জাপানী নারী এই প্রগতির যুগে ঘরের কোণে বসিয়া নাই। জীবিকার্জ্জনের চাপে পড়িয়া তাহারা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বাস্ চালনা, এরোপ্লেনের মধ্যে খাদ্য পরিবেশনের কাজ এবং যাত্রীগণের নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন, দোকানের কাজ, রেস্তরাঁতে পরিবেশন এবং চাকরাণীর কাজ, ষ্টীমারে যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখা, টাইপ করা, guide এর কাজ ইত্যাদি নানা কাজে তাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে। "অন্ন চিন্তা চমৎকারা", তাই জাপানী নারী আজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এইতো গেল তাহাদের অন্ন চিন্তার কথা। জাপানী নারী সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় দুনিয়ার সেরা স্থান অধিকার করিয়াছে। সহজ, সংযত, স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ অথচ মার্জ্জিত রুচি-বিশিষ্ট তাহাদের অঙ্গের অলঙ্করণ এবং পোষাকাদি। বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে তাহাদের কেশ-বিন্যাস। কটি পর্য্যন্ত লম্বিত কেশদাম তাহারা কত ভঙ্গীতেই না বিন্যস্ত করিয়া থাকে। দুনিয়ার অন্য কোথাও এত সুন্দর কেশ এবং তাহার পারিপাট্য দেখা যায় না। সপ্তম শতাব্দীর একটী জাপানী কবিতায় কেশ-বিন্যাসের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

"Nubatamano
Imo ga kurokami

কর্মরত জাপানী নারী

Koyoi moka
Ware nakitokoni
Nabikete nuramu".

কবিতাটীর মর্ম্ম—"সুন্দরী আজও তার দাঁড়কাকের মতো কালো চুল বাঁকিয়ে জড়িয়ে একেলা ঘুমোবে।"

অন্যান্য দেশের মতো স্বহস্তে এত সুন্দর কেশ-বিন্যাস করা যায় না। এই জন্য একদল ভাড়াটীয়া মেয়ে লোক আছে। আমাদের দেশে যেমন চুল কাটার Saloon জাপানে সেরূপ চুল বাঁধিবার দোকান আছে।

সাধারণতঃ রাত্রে ঘুমাইবার সময় আমাদের দেশের নারীদের চুল এলোমেলো হইয়া থাকে। আলুলায়িত কেশ অনেক সময় সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক বলিয়া আমাদের কাছে মনে হয় কিন্তু জাপানী নারী দিন রাত ২৪ ঘণ্টা তাহাদের চুলের পারিপাট্য বজায় রাখিতে ব্যস্ত। তাহারা এরূপ বালিশ ব্যবহার করে যাহাতে চুলের খোপা নষ্ট না হয় অথচ সুনিদ্রা হয়। অবশ্য এরূপ বালিশ ব্যবহারের ফ্যাশন দ্রুত লোপ পাইতেছে।

জাপানী নারী সম্বন্ধে জনৈক ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন—"নাক, চোখ, মুখ ও দেহের গঠন সব বিষয় ধরলে জাপানী নারীর মধ্যে নিখুঁত সুন্দরীর সংখ্যা অল্প। তবে এঁদের প্রত্যেকের মুখে এমন একটী কমনীয় ভাব আছে, যা বড়ই মনোহারী। প্রতি অঙ্গ সঞ্চালন সহজ সুন্দর ও শান্ত। তাতে ব্যস্ততা নেই, অথচ জড়তারও সম্পূর্ণ অভাব।" (১)

(১) জাপান—সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—

মূল পাঁপড়ির জড়িমা—জড়িত আধ বিকশিত আঁখি,
উজ্জ্বল যেন ছবির মতন, শান্ত যেন গো পাখী।
সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,
বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পাণি পাদ তার,
পাণ্ডু বদন, পাণ্ডু বরণ, মাথায় কেশের রাশি,
অতুল শিল্প ওষ্ঠ অধরে আধ বিকশিত হাসি। (২)

জাপানী নারীর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে বোধ হয় আর অধিক বক্তৃতা করার প্রয়োজন নাই।

"ফুল-পাপড়ির জড়িমা জড়িত আধ বিকশিত আঁখি"—জাপানী নারীর লজ্জা নম্র জড়িমার ভাব এই লাইনে বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি আধুনিকতার আবহাওয়ায় লালিত পালিত হইয়াও বর্ত্তমান যুগের নারীরা তাহাদের স্বাভাবিক লজ্জা-নম্র সঙ্কোচের ভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই।

'মিস য়ুরোপের মতো জাপানেও এখন 'মিস নিপন' আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ১৯৩১ সনে বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'আসাহী' সংবাদপত্র ইহার পঞ্চশত বার্ষিকী সংস্করণের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সময় সারা জাপানে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পূর্ব্বেও এরূপ আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু আসাহীর আয়োজনের বিশেষত্ব এই যে এই প্রতিযোগিতায় যেরূপ উচ্চ শ্রেণীর অধিক সংখ্যক যুবতী যোগদান করিয়াছে পূর্ব্বে সেরূপ করে নাই।

(২) সত্যেন্দ্রনাথের—তীর্থ সলিল

এই প্রতিযোগিতায় নিয়ম করা হইয়াছিল যাহাদের বয়স পনের বৎসরের বেশী আর যে সব যুবতী সাধারণতঃ কোন থিয়েটার বা নৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদান করে না অর্থাৎ শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্যই যে ব্যবসায়ের মূলভিত্তি যাহারা এরূপ কোন পেশাদার নয় তাহারা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল ফটোর মারফত। জাপানী নারী তখনও এত প্রগতিপরায়ণা হয় নাই যে সৌন্দর্য্য বিচারকদের সামনে হাজির হইয়া স্বীয় অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রদর্শনী খুলিবে। কাজেই প্রতিযোগী যুবতীরা তাহাদের নিজ নিজ একাধিক ফটো পাঠাইয়া দিয়াছিল। প্রায় এক হাজার যুবতী গড়ে ২৮০০ ফটো পাঠাইয়াছিল। বিচারকগণ মাত্র ১০ জনকে জাপানের সেরা সুন্দরী বলিয়া অভিহিত করেন। মিস্ তাওয়ারী সর্ব্বোচ্চস্থান দখল করে।

প্রথমতঃ বিচারকগণ ১০০ শত ফটো নির্ব্বাচন করেন। এই ফটোগুলি বেনামী ভাবে আসাহী পত্রিকায় পর পর পাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিচারকগণ ১০ জনকে পুরস্কার দিবেন ঠিক করিলেন। তারপর পাঠকদের মতামত আহ্বান করা হইল; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্ব্বাচন ব্যাপারে যাহারা বিচারক-গণের সঙ্গে একমত হইবেন তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হইল। ভোটের সংখ্যা হইল ৫৬২৬৪, তার মধ্যে ৬৩৭৫ জনই মিস তাওয়ারীকে ভোট দিয়াছে। বিচারক-গণ তাহাকে জাপানের সেরা সুন্দরী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এক ডাক্তারের মেয়ে তিনি—সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য তার। উচ্চতর শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় হইতে গ্রেজুয়েট উপাধি নেওয়ার পর পিতার কাজে সাহায্য করিতেছেন। সেলাই এবং চা তৈয়ারী বিদ্যায় তিনি খুব দক্ষ। সৌন্দর্য্য অটুট রাখিতে হইলে গভীর সুনিদ্রার দরকার তিনি মনে করেন। উচ্চ শিক্ষিতা, গুণবতী, বুদ্ধিমতী যুবতী তিনি। তখন তাহার বয়স ২২ বৎসর। তাহার মুখমণ্ডলে আছে একটা রহস্যময়ী অভিব্যক্তি।

নির্ব্বাচিত ১০ জন যুবতীর মধ্যে ৭ জন পুরস্কার নেওয়ার জন্য ওসাকায় আসেন। সমবেত জনমণ্ডলী হাততালি দিয়া এবং আনন্দ-ধ্বনি করিয়া জাপানের সেরা সুন্দরীগণকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। মিস তাওয়ারী বা মিস নিপনকে উপহার দেওয়া হইল তার নিজের একটী তৈলচিত্র, ফুজীওয়ারা যুগের ফ্যাশনের একটী সুন্দর আয়না, একটী সুন্দর 'কিমোনো' এবং একটী মিস নিপনের ছবি।

পাশ্চাত্য আদর্শে ও মানদণ্ডে জাপানী সুন্দরী যুবতীগণকে বিচার করিবার জন্য অধুনা অনেকের মনে একটা নূতন আইডিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দেশ কাল এবং পাত্র-ভেদে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বদলাইয়া থাকে। জাপানী নারীর শারীরিক গঠন পাশ্চাত্যের সুন্দরীদের গঠনের মতো নয়। কাজেই পাশ্চাত্য মানদণ্ডে জাপানী নারীকে বিচার করিলে চলিবে কেন?

জাপানী মেয়েরা সাধারণতঃ লম্বাহাতা "কিমোনো" পরিয়া থাকে, হাতা লম্বায় প্রায় ৩ ফুট। উচ্চশ্রেণীর কিংবা অভিজাত বংশের মেয়েরা প্রায় সব সময় "ফুরিসড্" পরে—লম্বা হাতাই

এই জাতীয় 'কিমোনোর' বিশেষত্ব। মধ্য শ্রেণীর কিংবা নীচ শ্রেণীর মেয়েরা কোন উৎসব অনুষ্ঠান কিংবা কোন স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে এইরূপ "ফুরিসড্" পরিয়া থাকে। বিবাহের সময় মেয়েদের এই পোষাক পরিতে হয়। বর্ত্তমান যুগেও এই 'ফুরিসডের' আদর কমে নাই। নব্য ফ্যাশনে যাহারা বিদেশী পোষাক পরিতে ভালবাসে তাহারাও সামাজিক বা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'ফুরিসড্' পরিয়া জাপানী জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে টকুগাওয়া রাজ-বংশের আমলে পুরুষেরাও এরূপ 'কিমোনো' পরিত কিন্তু ইদানীং আর ঐরূপ ফ্যাশন প্রচলিত নাই।

জাপানী নারীর পোষাকের একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। সে আজ ১৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন সবে মাত্র কোরিয়ান এবং চীনা কালচার জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ঐ যুগে কবরের ভিতর হইতে যে সব মৃণ্ময়মূর্ত্তি আবিষ্কার করা হইয়াছে সে সব দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, জাপানে সেই আদিম যুগে কোট এবং 'হাকামার'—(ঢিলা পায়জামা)—প্রচলন ছিল। আধুনিক ফ্যাশনের কিমোনো হইতে ঐ যুগের কোট একটু বিভিন্ন ধরণের ছিল—পাশ্চাত্য কোট সরু হাতাওয়ালা এবং আজানুলম্বিত।

নারা যুগে (৭১০-৭৯৩ খৃঃ) অভিজাত বংশের মেয়েরা চীনাদের অনুকরণে খুব জমকালো সুন্দর রেশমী পোষাক পরিত। এখনও জাপানীরা এরূপ পোষাকের মধ্যে দেবতার প্রতীক খুঁজিয়া পায়।

ঐ যুগে জাপানী পোষাকের মধ্যে নানারূপ রং এবং কারুকার্য্যের বাহার ছিল। পুরুষেরা পায়জামা এবং কোট আর মেয়েরা স্কার্টস্ (skirts) এবং কোট পরিত। মেয়ে এবং পুরুষের কোট প্রায় একরূপই ছিল। পুরুষেরা মাথায় মুকুট ধারণ করিত। মেয়েরা মাথার চুল ঠিক মধ্যস্থলে দুই ভাগ করিয়া বেশ সুন্দর সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া জাপানী ফ্যাশনে বাঁধিত। পুরুষের মাথায় মুকুটের সঙ্গে মেয়েদের খোপার বেশ সাদৃশ্য দেখা যাইত।

পোষাকের ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রতিপত্তি ও অবস্থার পরিচায়ক ছিল। এই ধারণা চীন দেশ হইতে আমদানী করা। হলদে রং ছিল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আভিজাত্যের লক্ষণ, তারপর বেগুণে, লাল, সবুজ, এবং গাঢ় নীল বর্ণের স্থান। যে সে ইচ্ছা করিলেই যে কোন রংএর কাপড় ব্যবহার করিতে পারিত না, আইনের সাহায্যে রংএর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইত।

তারপর হেইয়ান (Heian) (৭৯৪-১০৮৩ খৃঃ) যুগে যখন জাপান চীনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার প্রয়াস পায় তখন জাপানীরা নিজেদের রুচিমত পোষাকাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। চীনাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য জাপানীদের এই প্রথম চেষ্টা। এই যুগে ঢিলা পোষাকের প্রচলন হয়। অভিজাত বংশের লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে মাদুরের উপর পা গুটাইয়া উপবেশন করিত। মাদুরে বসিবার পক্ষে যাহাতে সুবিধা হয় সেই দিকে এবং জাপানের গ্রীষ্মকালের আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পোষাক তৈয়ারী হইত।

বর্ত্তমান যুগের ঢিলা 'কিমোনো' এই যুগের মেয়েদের পোষাকের অনুকরণে তৈয়ারী। হেইয়ান যুগের পোষাকাদি পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া নূতন ফ্যাশন ধারণ করিয়াছে।

এই যুগের মেয়েরা খুব লম্বা চুল রাখিত—লম্বা চুল ছিল গৌরবের বস্তু। নারা যুগে বিভিন্ন রং বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পরিচয় দিত, কিন্তু 'হেইয়ান' যুগে এই ফ্যাশন উঠিয়া যায়।

জাপানে ৪টা ঋতুই প্রধান। জাপানীরা বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিল রাখিয়া বিভিন্ন রংএর পোষাক এক এক ঋতুতে পরিত। বসন্তের ফল-ফুলের রংএর সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া রাঙা পোষাক, গ্রীষ্মের ফুলদলের সঙ্গে মিল রাখিয়া বেগুণে রংএর পোষাক ব্যবহার করা হইত। প্রকৃতির সঙ্গে শরীর-মনের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনই এইরূপ পোষাক পরার উদ্দেশ্য।

কামাকুরা এবং মুরোকাচা (১১৯৪—১৫৭২ খৃঃ) যুগে সামুরাইগণ ছিল দেশের শাসনকর্ত্তা। পূর্ব্ব যুগের ফ্যাশন এবং পোষাকাদি তখন অনেকটা সাদাসিধে রকমের হইয়া যায়। জমকালো পোষাক বড় একটা প্রচলিত ছিল না; পূর্ব্ব যুগের সাধারণ পোষাকই ছিল তখন উৎসব-অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট সাজ-সজ্জা। সাদাসিধে জীবন-যাপন প্রণালী এবং ফ্যাশনের বাহাদুরির অভাবই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। মেয়েরা তখন 'হাকামা' বা জাপানী পায়জামা পরা ক্ষান্ত করে আর 'কিমোনো' আরও পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে।

তার পর আসে ইয়েদো (Yedo) যুগ (১৫৭০); প্রায় ৩০০ শত বৎসর এই যুগের স্থায়িত্ব কাল। জীবন-ধারা ধীর

মন্থর গতিতে চলিয়াছে, তাড়াহুড়া কোথাও যেন নাই, চারিদিকে শান্তি, স্থবিরতা, অসাড়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা বিরাজমান—জাপানী মন যেন ঘুমঘোরে অচেতন। নূতন জিনিষের বা ফ্যাশনের তখন আবির্ভাব ঘটে নাই; চিরাচরিত সাজসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল জাপানের সামাজিক জীবনের অমূল্য সম্পদ। জাপানীরা ঐ যুগে ছিল ভয়ানক রক্ষণশীল। পুরাতনকে তাহারা জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। নিছক আমোদ আহ্লাদের অঙ্গ হিসাবে মেয়েরা তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

এই যুগ সামুরাইগণের মিলিটারী জীবনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। মিলিটারী নিয়মানুবর্ত্তিতা, সংযম নির্দ্দিষ্ট কায়দা মাফিক জীবন যাপন অথবা বাহুল্যের অভাব এই যুগের বৈশিষ্ট্য। কাজেই পোযাকাদিও তখন বড় একটা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু সামুরাইগণের কড়াকড়ি যখনই একটু শিথিল হইয়া পড়িত তখনই নিত্য নূতন ফ্যাশনের আমদানী হইত।

ইয়েঁদো যুগের কালচার এবং সামাজিক রীতিনীতির স্থান অধিকার করে মেইজী যুগের কালচার এবং রীতিনীতি। পাশ্চাত্য কালচার ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জাপান তখন নানা দিক দিয়া একটা আমূল পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি জাপানকে গ্রাস করিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এই আমূল সংস্কার এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে জাপানী মনের আনাচে কানাচে একটা গোপন বিদ্রোহের

ভাব ক্রমেই বাসা বাঁধিতে থাকে এবং খাঁটী উন্নত ধরণের জাপানী পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার জন্য সকলের মধ্যে একটা সাড়া পরিয়া যায়। কাজেই পাশ্চাত্য ফ্যাশনের মোহ জাপানী মনকে তখন বেশী দিন কাবু করিয়া রাখিতে পারে নাই। এই স্বদেশীপনা কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। গত য়ুরোপীয় মহাসমরের পর জাপানে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দেয়। নূতন ধরণের দালান-কোঠা, ঘরবাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ রীতিনীতি সবই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফল। পাশ্চাত্য পোষাকে সজ্জিত হইয়া চলা-ফেরা এবং কাজকর্ম্ম করা সুবিধাজনক এই জন্যই হয়তো জাপানীরা এই পোষাকের এতো ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ভক্তের সংখ্যা এখনও খুব বেশী নয়, শতকরা মাত্র ৩ জন। তবে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে জাপানী নরনারী সৌন্দর্য্য ও সুরুচিজ্ঞাপক জমকালো পোষাকের পরিবর্ত্তে পশ্চিমের কাটাছাঁটা, কর্ম্মোপযোগী, সংক্ষিপ্ত ধরণের পোষাকই পরিতে শিখিবে।

জাপানী নৃত্যগীত

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অর্থব্যঞ্জক। য়ুরোপ, এশিয়া, আমেরিকার বিচিত্র সভ্যতা, কালচার-এর মিলনক্ষেত্র এই জাপান। যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতার ঢেউ আসিয়া আঘাত করিয়াছে জাপানের শিক্ষাপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ, নমনীয় চিত্তকে। শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার ডালি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে জাপানীর পায়ের তলে।

অতিথিপরায়ণ জাপানী চিত্ত বিদেশী কালচারকে অবজ্ঞা করিয়া ফিরাইয়া দেয় নাই—অন্ততঃ চিরদিনের তরে। বিচারের পরশ পাথরে ঘষিয়া তাহারা সব কিছুর অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছে। যাহা কিছু ভাল, সুন্দর, প্রগতিশীল এবং জাপানী মনের পরিপোষক তাহাই তাহারা সাদরে বরণ করিয়াছে। অবশ্য স্বদেশের ভাল জিনিষকেও তাহারা কখনও বাদ দেয় নাই।

জাপানী নৃত্যগীতের উপর বিদেশী বিশেষতঃ জার্ম্মান, রাশিয়ান, ফরাসী, ইটালিয়ান, আমেরিকান প্রভৃতি সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার প্রভাব খুব বেশী। দশম শতাব্দী হইতে জার্ম্মানীর গোঁড়া শ্রেণীভুক্ত সঙ্গীতকলা জাপানের মনের উপর ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতক্ষেত্রে জাপান জার্ম্মানীকেই বেশী অনুসরণ করিয়াছে। জাপানী সঙ্গীতের প্রাণের প্রতি স্তরে জার্ম্মান-সঙ্গীত তাহার প্রাণবান রস ও রূপ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে আরও জীবন্ত করিয়া

তুলিয়াছে। টোকিয়ো সঙ্গীত-বিদ্যালয় (Tokyo School of Music) একমাত্র সরকারী এবং প্রাচীনতম সঙ্গীত শিক্ষার স্থান। যে সকল বিদেশী সঙ্গীতবিদ্ শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তাঁহারা সকলেই জার্ম্মানী বা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে। ইহা ছাড়া যে সব জাপানী ছাত্র বিদেশে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয় তাহাদের অধিকাংশই হয় জার্ম্মানী, নয় অষ্ট্রিয়ায় গমন করে। হেণ্ডেল, মোজার্ট, বিঠুভেন ইত্যাদি সঙ্গীতাচার্য্যের অপূর্ব্ব কলাকৌশল ও বিশ্ববিশ্রুত অবদান অনায়াসে জাপানে ঢুকিয়া পড়িবার ইহাই একমাত্র কারণ।

সঙ্গীত-বিদ্যায় বর্ত্তমান যুগে জাপান নিজের অন্তর্নিহিত সঙ্গীত-প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছে। যন্ত্র-সঙ্গীত, শব্দ-সঙ্গীত, অপেরা, অরকেষ্ট্রা, বেতার-সঙ্গীত, সবাকচিত্র-সঙ্গীত ইত্যাদি নানাজাতীয় সঙ্গীত-বিদ্যায় জাপানীরা অভাবনীয় সৃজনশক্তি, অপূর্ব্ব দক্ষতা, কলাকৌশল দেখাইয়াছে। বহু নামজাদা গায়ক, বাদক ঐ দেশে জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাশ্চাত্য গান বাজনায় তাহারা খুবই পারদর্শী। মিঃ কথাকু ইয়ামাদা, হিডেমারু কনোরী, মিসেস্ নাগাই, মিস চিয়াকো সাটো ইত্যাদি অসংখ্য গায়ক, বাদকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। The Tokyo Academy of Music বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে গান বাজনার আয়োজন করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া জাপানের বিভিন্ন সামাজিক এবং ধর্ম্মীয় উৎসব আয়োজনে নানাপ্রকার নৃত্য ও গান-বাজনার আসর জমিয়া উঠে।

প্রাচীন-পন্থী নৃত্যকলার স্থান দখল করিয়াছে নূতনতম নৃত্যের ভঙ্গী, ব্যঞ্জনা এবং ঠাট। প্রাচীন ধরণের নৃত্যের ছন্দ, রূপ এবং রস জাপান হইতে বিদায় গ্রহণ করে নাই। তথাপি বলিতে হইবে যে আধুনিকতাই বর্ত্তমান জাপানী-নৃত্যের প্রাণসম্পদ। রাশিয়া এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশের নৃত্যকলা অধুনা জাপানে অতি সম্মানের আসন দখল করিয়াছে। রাশিয়ার অপ্সরী পরলোকগত মিসেস আনা প্যাভলোভা একবার জাপান ভ্রমণে যান। তিনি এবং অন্যান্য কতিপয় নর্ত্তক-নর্ত্তকীর সংস্পর্শে আসিয়া নব্য জাপানের নৃত্যকামী উৎসাহী তরুণ-তরুণীর দল স্বভাবতঃই পশ্চিমাগত নৃত্যের নূতন ছন্দ, সাবলীল গতি এবং প্রাণবন্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া যায়। একটু অনুকরণ স্পৃহা, নূতনকে সহজে দখল করিবার মতো মনের গতি এবং শারীরিক নৃত্য-প্রবণতা অতি শীঘ্র তাহাদিগকে সেরা নর্ত্তক-নর্ত্তকী করিয়া তুলিল। বিদেশী দক্ষ নর্ত্তক-নর্ত্তকীর হাতে শিক্ষা পাইয়া ঐ দেশেও একদল নৃত্য-কলাবিদ বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হইল। মিস ফুজীমা এবং তাহার চেলা চামুণ্ডারা ঠিক এই সুযোগে তাহাদের চির অভ্যস্ত প্রাচীন ধরণের নৃত্যকলার প্রদর্শনী না খুলিয়া নূতন আমদানী করা নৃত্যকে জাপানী ছাঁচে ঢালিয়া একটা নবতম সাজ পরাইলেন। মিঃ তাকাতা জাপানী নৃত্যকলায় একটা নূতন ছন্দের ঢেউ আনিয়াছেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে এই সংস্কার-প্রচেষ্টা খানিকটা পিছাইয়া পড়ে কিন্তু তাহার যোগ্যতম জীবন-সঙ্গিনী মিসেস হারা মৃত স্বামীর নৃত্যের আদর্শকে আবার উঁচু করিয়া ধরেন। তাহারই চেষ্টায় তাকাতা নৃত্যসমিতি (Takata Dancing Society)

এখনও বাঁচিয়া আছে। জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিনেমা এবং থিয়েটারের নৃত্য-গীত বিভাগের ইনি অধ্যক্ষ। তাহারই তত্ত্বাবধানে এই বিরাট থিয়েটারের সভ্যগণকে গান-বাজনা এবং নৃত্য-গীত শেখানো হয়। প্রতি বৎসর বসন্ত এবং হেমন্তকালে টোকিয়ো এবং অন্যান্য সহরে তাহারই সৃষ্ট নিত্য নূতন নৃত্যের অভিনয় দেখানো হয়।

মিঃ বাকুইশী পরলোকগত মিঃ তাকাতার চেয়ে কোন অংশে হীন নহেন। তবে উভয়ের নৃত্যকলার প্রভেদ দৃষ্ট হয় বিস্তর—ইশীর নৃত্যকলায় আছে দুর্জ্জয় উচ্ছৃঙ্খলা এবং অদম্য সাহসের নিখুঁত ব্যঞ্জনা। আর তাকাতার নৃত্যে আছে একটা কমনীয়তা এবং অতি সূক্ষ্ম রুচিজ্ঞানের পরিচয়। মিস ফুজীমা পুরাতনের আবেষ্টন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া নূতনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন; নিত্যনূতন সৃষ্টি তাঁর বিচিত্র ছন্দ ও তালে দোলায়মান। টামামী হানায়াগী এবং সুমী হানায়াগীও মিস ফুজীমার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পুরাতন জাপানী নৃত্যের মামুলী ছন্দকে বিদায় করিয়া ইঁহারা হাল ফ্যাশনের নৃত্যের প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মূল জাপানী ভাষায় যে সব নৃত্য-গীতের পুস্তকাদি আছে সেগুলিকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন রূপ দিবার চেষ্টা ইঁহারা করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য ধাতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচনাকে নৃত্যের ছন্দে রূপায়িত করিবার জন্যও ইঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আশা করা যায় নব্য জাপান ইঁহাদের এই নবতম অবদান সাদরে গ্রহণ করিবে।

এখানে আমরা কতিপয় জাপানী নৃত্যের বিষয় আলোচনা করিব। প্রায় ২০০ শত খৃষ্টাব্দে চীন হইতে বুগাকু নৃত্য

আমদানী হইয়াছিল—সঙ্গে আসিয়াছিল চীনা নৃত্য সঙ্গীত গাগাকু। সেই সময় হইতে বুগাফু জাপানে গৃহ-নৃত্য হিসাবে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বংশপরম্পরাক্রমে জাপানী সম্রাটগণ এই নৃত্যের আদর করিয়া আসিয়াছেন। এখনও এক বিশিষ্ট নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দল রাজসভায় এই নৃত্যকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। এক সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বুগাফু জাপানে প্রবেশ লাভ করে এবং আজ পর্য্যন্ত ইহার স্বকীয়ত্ব এবং প্রাচীনত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই জাপানের প্রাচীনতম নৃত্য-পদ্ধতি।

বুগাফু নৃত্য দুই ভাগে বিভক্ত—সাবু এবং উবু—সাবু নৃত্য-কারীরা পরে লাল রংয়ের পোষাক এবং উবু নৃত্যকারীরা পরে সবুজ রংয়ের পোষাক। কোন কোন সময় মুখে একরূপ রঙীন কাঠের তৈয়ারী খোলস পরিয়া নৃত্য করা হয়।

বিভিন্ন ঢংয়ের বুগাফু নৃত্য প্রচলিত আছে যথা, বুবু—তরবারী নিয়া এই নৃত্য করা হয়; হাশীরিমানো—প্রাণবন্ত যুদ্ধং দেহি নৃত্য; ডবু—ছেলেদের নৃত্য। মাথায় ফুলের সাজ পরিয়া এবং মুখে রং লাগাইয়া তাহারা নৃত্য করে। ওসাকার শিটেনোজী মন্দিরে কোন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বুগাফু নৃত্য-প্রদর্শনী হয়। তখন একটা পুকুরের উপর পাথরের তৈয়ারী (৩৮ × ২৬) বর্গফুট পরিমাণের বিরাট আয়তক্ষেত্র আকারের ষ্টেজ করা হয়। ষ্টেজের চারি কোণে কৃত্রিম কাগজের প্রকাণ্ড ফুল সাজানো হয়। ইৎসুকুশীমা মন্দিরে যে নাচ হয় তাহার জন্য সেখানে সমুদ্রের তীরে একেবারে সমুদ্রের ঢেউয়ের সন্নিকটে এক বিরাট ষ্টেজ করা হয়। ঐ ষ্টেজের উপর মহা জাঁকজমকের সঙ্গে বুগাফু নৃত্য দেখানো হয়।

ওসাকার সুমিয়োসী (Sumiyoshi) মন্দিরে ছেলেদের ডবু নৃত্য হয়। এই নৃত্যের বিশেষ নাম করিয়োবীন (Kariyobin)—একটা স্বর্গীয় পাখী বিশেষ। নৃত্যের তালে তালে পিতলের বাজনা বাজানো হয়। এই বাজনা নাকি ঐ পাখীর গানের অনুকরণ করে।

এই বুগাফু নৃত্য জাপ-সম্রাটের রাজ সভায়ই কেবল অনুষ্ঠিত হয়। রাজপরিবারের সঙ্গীত-বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় বিশেষ কোন উপলক্ষে যথা, রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় যখন রাজদরবারে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয় কিংবা যখন কোন বিদেশী যুবরাজ জাপ-সম্রাটের অতিথি হয়। আজকাল বিদেশী রাজদূত বা সাংবাদিকদের আনন্দ যোগাইবার জন্য এই নৃত্যের আয়োজন হয়। মাঝে মাঝে সাধারণ জাপানী প্রজা যে এই নৃত্য দেখিবার অধিকার না পায় এমন নহে।

প্রমাণ পাওয়া যায় এই বুগাফু নৃত্য প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে চীন এবং ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে যে সঙ্গীত-সম্পদ রহিয়াছে তাহাকে আধুনিক পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিলে হয়তো কালে প্রাচ্যের এই সঙ্গীতময় নৃত্য পাশ্চাত্যেও প্রসার লাভ করিতে পারে। তাহার প্রমাণ বেরণ কনো (Baron Konoe)। তিনি জাপানে পাশ্চাত্য ধরণে একটা ঐক্যতান বাদকের পার্টি গড়িয়া তুলিয়াছেন। ১৯৩৩ সনে বার্লিনে তিনি সদলবলে এক অভিযান করেন। তখন পাশ্চাত্য জগত গাগাকুর (Gagaku)—বুগাফুর

সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে যে সঙ্গীতের—তালমান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। আশা করা যায় কালে হয়তো পাশ্চাত্য জগত আস্তে আস্তে প্রাচ্যের এই নৃত্য-সঙ্গীতের ভক্ত হইয়াও পড়িতে পারে।

উত্তর জাপানের হিদাতাকায়ামা একটী সুন্দর সহর—চারিদিকে শৈল-শ্রেণী ইহাকে একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের আবেষ্টন দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বসন্ত এবং হেমন্তকালে এখানের হাই (Hai) মন্দিরে এবং হাকিমান (Hachiman) মন্দিরে যথাক্রমে নৃত্যোৎসব হইয়া থাকে। প্রতি ২৮ বৎসরে একবার টাকায়ামা মাৎসুরী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অঞ্চলের ৬০০ শত মন্দিরে এই উৎসব হয়। ইহা কোন মন্দির বিশেষের উৎসব নয়। উৎসব উপলক্ষে নানারূপ নৃত্যের আয়োজন করা হয়। মুখে বিচিত্র পোষাক, সিংহ খোলস, বাঁশীর বাজনা, ঢাকের শব্দ—এই আবেষ্টনীর মধ্যে নানা জাতীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়।

১৮৭২ সনের মার্চ্চ মাস হইতে ওসাকায় বিখ্যাত চেরী-নৃত্যের * (Miyako Odori) আয়োজন হইয়া আসিতেছে। চারিদিকে চেরী ফুলের বাহার—আকাশ বাতাস ফুলের রংএ রঞ্জিত,—পাহাড়ের সারি, আর অদূরে দাঁড়াইয়া পাইন বৃক্ষের শ্রেণী ; সুগঠিত তাহাদের দেহভঙ্গী—এইরূপ নন্দন-কানন-সুলভ আবহাওয়ার মধ্যে চেরী-নৃত্য হইয়া থাকে। ইচিরিকি জাপানের এক প্রসিদ্ধ চায়ের আড্ডা—এই আড্ডাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ যুগের সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ম্যাদাম হারুকু এবং ঐ চায়ের দোকানের মালিক সুগিওরা এই নৃত্যের প্রবর্ত্তন করেন। আজও তাহার

জাঁকজমক, চিত্তহারী ঢং, সাজসজ্জা এবং সর্ব্বোপরি ইহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যটুকু জাপানী মনকে পাইয়া বসিয়া আছে। জাপান চিরকালই প্রকৃতির পূজারী, এই সব উৎসবে তাহাদের সেই পূজাপ্রবণ মনেরই সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩১ সনে ওসাকায় যে নৃত্যোৎসব হইয়াছিল তাহাতে ২৪ জন বালিকা দুই দলে বিভক্ত হইয়া চেরী ফুলের লড়াই করিয়াছিল—একদল অন্য দলকে চেরী ফুলের তোড়া দিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে আক্রমণ করে। দুই দলের দুই রকম পোষাক। প্রতি বসন্তে চেরী ফুলের অপরূপ আবহাওয়ার মধ্যে এই মনোমদ নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। সারা জাপানের সকল শ্রেণীর নরনারী, বালকবালিকারা দলে দলে আসে এই চেরী-নৃত্য দেখিতে। কিয়টো সহরের চেরী-নৃত্য জাপানে খুব বিখ্যাত; সহরের পূর্ব্বভাগে কামো নদী—তার তীরে একটা থিয়েটার। এখানে দেখানো হয় চেরী-নৃত্য (মিয়া-কোওদোরী)। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "যে পঞ্চাশ বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক নর্ত্তকী এই নৃত্য প্রদর্শন করে তারা সকলেই এক পল্লীতেই বাস করে। দেহের সৌন্দর্য্যে তারা জাপানের সকল নর্ত্তকীর সেরা—তাদের অন্তরও যে সৌন্দর্য্য-রসে আবাহন কোরে আছে তাদের প্রদর্শিত নৃত্যই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়।"

জাপানী মনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের নৃত্যগীত এবং অন্যান্য উৎসবে। সৌন্দর্য্যের রাণী এই জাপান। প্রকৃতি তাহাদের অনুরক্ত, যেন সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছে এইখানে। জাপানী মনও স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের উপাসক; তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের সামাজিক, ধর্ম্মীয় আচার

অনুষ্ঠানে, নৃত্যে, গানে এবং চারুশিল্পে। প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের নাড়ীর যোগ—প্রকৃতির শিশু তাহারা—প্রকৃতির রূপকে তাহারা আপন জীবনে রূপায়িত করিতে চায় নানা ভাবে, নানা কর্ম্মে এবং অনুষ্ঠানে।

এখানে তাহাদের বিখ্যাত অগ্নি-উৎসবের কথা বলা দরকার। বর্ত্তমান ওসাকা হইতে মাত্র ৩০ মিনিটের পথ, পাহাড়ের উপর নারার এক মন্দিরে গত হাজার বৎসর যাবত এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। রাত্রের গভীর অন্ধকারে সারা রাত ধরিয়া বিশাল-কায় মশালের খেলা দেখানো হয়; সে যেন এক প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা—বাতাসের নয়, আগুনের। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, "রাত্রের গভীর অন্ধকারে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। উৎসব সুরু হয় নাই। আয়োজনের তোড়জোড় বেদম চলিয়াছে। মন্দিরের বেদীর পাশে বসিয়া পুরোহিতেরা জোরে জোরে মন্ত্র আওড়াইতেছে, বিকট ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণ সোরগোল করিতেছে। এই আগুনের অনুষ্ঠানের বয়স প্রায় ১১৭০ বৎসর। অনুষ্ঠানের মধ্যে সংযত ভাবের অভাব। আছে কেবল হৈ চৈ, আনন্দের বিকট অভিব্যক্তি আর আদিমযুগীয় মনোভাব। প্রাচীনকে যাহারা উপাসনা করে; নূতনের চমক লাগিয়া যাহাদের চোখ ঝলসায় নাই তাহারা দলে দলে আসিয়াছে এই উৎসব দেখিতে। যাহা কিছু দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহাতে আমার মনে হইল আমরা মানব জাতির শৈশব কালের প্রায় ১০০-হাজার বৎসর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রি শেষে

ভোরের আলোতে যখন রাস্তায় বাহির হইয়া আধুনিক যুগের যানবাহন চোখে পড়িল তখন বোধ হইল এই মাত্র যে রাত্রির আগুনের খেলা দেখিয়া আসিলাম সেই রাত্রের পাশে আবার কি করিয়া এই সব আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন থাকিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানে এখনও প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান রহিয়া গিয়াছে—আদিমযুগীয় রঙ্গ-রসই তাহাদের প্রাণবস্তু। কি আজব দেশ! প্রাচীন—প্রাচীন—চির প্রাচীন, আবার নূতন—নূতন—চির নূতন এই জাপান।" কথিত আছে একদিন কুয়াশো নামক এক পুরোহিত বর্ত্তমান ওসাকার নিকট সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল অদূরে ঐ সমুদ্রের ঢেউগুলির দিকে। ঢেউএর পর ঢেউ নৃত্য করিয়া আসিতেছে পাড়ের দিকে। কি যেন একটা দেখা যায় ভাসিয়া আসিতেছে ঢেউ-এর নৃত্যের তালে তালে। ৭ ইঞ্চি উঁচু, একাদশ মুখ-বিশিষ্ট একটা কোয়ানন (Kwannon) মূর্ত্তি—হাতে নিয়া তিনি বুঝিলেন মূর্ত্তির মধ্যে জীবন্ত প্রাণীর দেহের উত্তাপ রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটিকে তিনি নিয়া স্থাপিত করিলেন নারার মন্দিরে। সেই হইতে প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। জাপানীদের বিশ্বাস এই উৎসব মহাজাঁকজমকের সহিত সমাধা না করা পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের আমেজ দেশবাসীর সারা দেহ-মন সতেজ করিয়া তোলে না।

জাপানী থিয়েটার এবং সিনেমা

বর্ত্তমান সময় জাপানী থিয়েটার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) কাবুকী—প্রাচীন-পন্থী, (খ) শীম্পা—সাধারণের রুচি মাফিক আধুনিক থিয়েটার এবং (গ) শিনগেকী—কঠিন সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হয় এই সব থিয়েটারে, দর্শকবৃন্দ থিয়েটার দেখিয়া ভাবিতে শিখে; কেবল মামুলী তামাসা, রং ঢংয়ের থিয়েটার নয় এইগুলি। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর থিয়েটার অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ের মতো বিরাট আকারে, বহু টাকা মূলধন খাটাইয়া চালানো হয়। ২।৪ টা থিয়েটার কোম্পানীর হাতেই প্রায় সবগুলি থিয়েটার। শেষোক্ত শ্রেণীর থিয়েটার ছোটখাটো ধরণের, ব্যবসায়ের নীতিতে এইগুলি চলে না। একটা নূতন থিয়েটারী আন্দোলন করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, যাহাতে দেশের মধ্যে থিয়েটার-ব্যাপারে একটা নূতন চিন্তার ঢেউ উঠে।

কাবুকী খুবই মার্জ্জিত-রুচি মাফিক। কিন্তু আধুনিক জীবন-ধারার সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই—শীম্পা বর্ত্তমান যুগে নিছক ব্যবসায়পন্থী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার দর্শকবৃন্দের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দর্শকদের মনস্তুষ্টির জন্য যে সব অভিনয় করা হয় তাহার মূল্য ব্যবসায়ের মাপকাঠিতে খুবই বেশী—প্রকৃত নাটকীয় মূল্য থাকুক আর না থাকুক। এক যুগে শীনগেকী খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল

এবং সংবাদপত্র মহলে ইহার সুখ্যাতির ঢোল খুব জোরে পিটানো হইত। কিন্তু এই যুগে ইহা আর তেমন জোরে সোরে সাধারণের মধ্যে সংবাদপত্রের মারফতে প্রচারিত হয় না। তা' ছাড়া সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন, ইহার নাটকীয়ত্ব এবং নাটকীয় টেক্‌নিকের অভাব—ইত্যাদি নানা কারণে ইহার আদর কমিয়া গিয়াছে।

থিয়েটার এখন একটা দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সঙ্কট অনেকটা সারা দুনিয়া-ব্যাপক সমস্যা বিশেষ। সর্ব্বত্রই থিয়েটারের অধঃপতন এবং সিনেমার উন্নতি এবং জনপ্রিয়তা দেখা যায়।

কিন্তু জাপানের বেলায় প্রকৃত সমস্যা হইল—কাবুকীর স্থান দখল করিতে পারে সাধারণের জন্য এমন কি থিয়েটার হইতে পারে? বিরাটায়তন থিয়েটারের জন্য কী জাতীয় অভিনয় নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে একদল বলিতেছে যে বড় রকমের থিয়েটারের সঙ্গে গান বাজনা করিতে হইবে এবং অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই গান গাহিবে। কাবুকী জাপানের প্রাচীন সম্পদ এবং যুগ যুগ ধরিয়া এই নীতির থিয়েটার জাপানীকে আনন্দ ও শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে। গত তিন শতাব্দীর প্রবল সামাজিক বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কাবুকী তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত নাটকীয় আর্ট ও জীবনীশক্তি নিয়া এখনও টিকিয়া আছে। ইহা কি কম কৃতিত্বের কথা? নিশ্চয়ই কাবুকীর মধ্যে দৃঢ়-মূল এমন কিছু মৌলিকত্ব এবং টেকনিক আছে যাহা ইহাকে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

শব্দসম্পদ না অভিনয় নাটকের প্রাণবস্তু—এই নিয়া একটা তর্ক উঠিয়াছে। নাট্যকার সেক্সপিয়ার এবং ইবসেনের নজীর দেওয়া হয় এই সব তর্ক মীমাংসার জন্য। কিন্তু মনে হয় সব তর্ক, সব মত বিরোধের মীমাংসা হইতে চলিয়াছে জাপানী থিয়েটারের সহজ স্বাভাবিক গতির মধ্য দিয়া। এই যুগ সনৃত্য নাটকের যুগ —নৃত্যগীত-বহুল নাটক সেখানে এখন খুব আদর পায়। ১৯৩৭ সনের রিপোর্টে দেখা যায় জাপানের বড় বড় থিয়েটারে অনেক সনৃত্য কাবুকী নাটকের অভিনয় করা হইয়াছে। সম্প্রতি কাঞ্জিঞ্চু নামক একটি নাটকের অভিনয় এক বৎসরে (১৯৩৪ সনে) ২।৩ বার করা হইয়াছে। পূর্ব্বে হয়তো ইহার অভিনয় ১০ বৎসরে একবার হইত। মিস মিজুতানী এইরূপ নৃত্যবহুল নাটকের ষ্টার (star); তাহার চেষ্টায় এইরূপ বহু নাটকের অভিনয় করা হয়। জাপানী সনৃত্য নাটকের বিশেষত্ব এই যে ইহা অর্দ্ধেক নৃত্য এবং অর্দ্ধেক অভিনয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহার মধ্যে আছে সক্রিয় ছন্দের দ্যোতনা—কথার বাহুল্য কম, আছে বেশী সাবলীল গতি ও ক্রিয়াশীল অভিনয়। এই জাতীয় অভিনয়ের দিকে এখন লোকের ঝোঁক পড়িয়াছে এবং এই সব অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনার ভাব দৃষ্ট হয়। শব্দ-সম্পদ, সঙ্গীত এবং সক্রিয় অভিনয় নাটকের অপরিহার্য্য অঙ্গ বটে কিন্তু ইহাদের পেছনে থাকিবে মানব-মনের চিরন্তন এবং স্বাভাবিক ভাবের তরঙ্গ—ইংরেজীতে বলা যায় 'agitation of feelings'. এই ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায় দুই উপায়ে—(ক) সমাজে চলিত ভাবধারার অভিব্যক্তি থাকিবে নাটকে বা (খ) অতি-

মাত্রায় স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার স্ফুরণ দেখা যাবে নাটকের অভিনয়ে। এক কথায় আধুনিক বাস্তব-জীবনের খাঁটি সমস্যার নিখুঁত আলেখ্য হইবে নাটকের অভিনয়। জাপানী থিয়েটার সংস্কারের চেষ্টার মূলে রহিয়াছে এই নীতি।

কতিপয় ধনিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় বর্ত্তমান জাপানী থিয়েটার ধনতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ের মতো বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে। একই কোম্পানী বা ট্রাষ্টের হাতে হয়তো বহু থিয়েটার ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শচীকো (Shochiku) কোম্পানীর অধীনে এই যুগে জাপানের প্রায় অধিকাংশ অভিনেতা, অভিনেত্রী চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে।

বুনরাকু (Bunraku) জাপানের একরূপ পুতুল থিয়েটার। গত তিনশত বৎসর যাবৎ ওসাকা অঞ্চলে এই ধরণের থিয়েটার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। কাবুকী থিয়েটার দেখে যাদের অবসর ও অর্থ আছে প্রচুর তারাই; বুনরাকু দেখে শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা—যারা বুদ্ধিজীবী। কাবুকীর টিকেট খুব দামী আর বুনরাকুর টিকেট অনেকটা সস্তা। আর এই নাটকে আছে আর্টের খেলা, এই জন্যই হয়তো বুদ্ধিজীবীরা এইগুলি বেশী পছন্দ করে। একটা পুতুল—পুতুল নয় যেন জীবন্ত মানুষ, পরণে তার জাপানী কিমোনো (kimono) ও অন্যান্য পোষাক, চোখ দুটা তার প্রাণ কেড়ে নেয় দর্শকের—হয়তো কোন গল্প বিশেষের বিশিষ্ট চরিত্র ইহার মধ্যে ফুটানো হয়—সবে মিলে যেন সৃষ্টি করে গল্পের একটা স্বপ্নপুরী। একটা

পুতুলকে কেন্দ্র করিয়া তিনজন অভিনেতা অভিনয় করে। তাহাদের গানের মিহিন সুর, প্রাচীন জাপানী সঙ্গীত সেমিসেনের (Samisen) স্বর্গীয় আবহাওয়া, আর পুতুলের জলজ্যান্ত ভাবের অভিব্যক্তি দর্শকের চোখে যেন একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করে। তাহারা অভিনয় দেখে আর ভাবে বুঝি আর তাহারা এই মাটির দুনিয়ার জীব নয়, কোন এক কল্পলোকে বদলী হইয়াছে। শচীকু কোম্পানী এই সব পুতুল থিয়েটারের মালিক। অপেরা নাটকের দিকে এখন জাপানীদের নজর পড়িয়াছে। কেবল মেয়েদেরে নিয়া জাপানে তিনটা অপেরা পার্টি গঠিত হইয়াছে। পুরুষের স্থান নাই ইহাদের মধ্যে। ইদানীং সেখানে Rose Paris নামক এক অপেরা নাটকের অভিনয় হইয়াছে। অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ স্বতঃই মনে করিয়াছে যে তাহারা প্যারি হইতে বেশী দূরে নয়—(living not far from Paris). উপরি উক্ত শচীকু কোম্পানীর হাতে এইরূপ দুইটা পার্টি আছে। এই কোম্পানী অনেকগুলি সিনেমার মালিক। Capitalist এবং proletariat এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে আধুনিক সমাজ—সে চাই ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, চাই সাহিত্য বা থিয়েটারের ক্ষেত্রে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় গরীব আর ধনীর মধ্যে বিরোধ। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া আবার অন্য দুই দলের সৃষ্টি হয়—সে দল-সৃষ্টি মতবাদের দিক দিয়া। একদল ধনিকদের পক্ষ সমর্থনকারী ও অন্য দল সবহারা গরীবদের পক্ষপাতী। থিয়েটারের ক্ষেত্রেও জাপানে এই দুইটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হইয়াছে—ঠিক যেমন ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোটী কোটী টাকার

মূলধন খাটাইয়া কেহ কেহ ব্যবসায় করে আর কেহ বা যৎসামান্য মূলধন নিয়া তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়। জাপানে প্রলেটারিয়েন মতবাদী এক শ্রেণীর থিয়েটার গজাইয়া উঠিয়াছে, ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে ইহাদের ভীষণ বিরোধ। ৩।৪ টি ছোট খাটো প্রলেটারিয়েন দল খুব জোরে সোরে কাজ সুরু করিয়াছে। সমাজের যাহারা তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের সহানুভূতি ইহারা পায় না বটে, কিন্তু দরিদ্র সমাজ বা যাহারা দরিদ্র-দরদী তাহাদের পূর্ণ সহানুভূতি এবং সাহায্য পায়।

তাহাদের নাটকের বিষয়-বস্তু সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের চলিত স্রোতের গতি এবং ধারা। পাশ্চাত্য লেখকদের নাটক ইহাদের নিকট আদর পায় না।

অভিনেতা কিকুগোরো

জাপানের প্রাচীন পন্থী কাবুকী থিয়েটার প্রসিদ্ধ অভিনেতা কিকুগোরোর অপরূপ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের মধ্যে নূতন রূপ পাইয়াছে। কাবুকী চিরকালই ভয়ানক রক্ষণশীল—নূতনকে সে ভয় করিয়া চলে। কিন্তু কিকুগোরো পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় সাধনের জন্য তাহার অপূর্ব্ব সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিভার আশ্রয় নিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, কাবুকী পুরাতন কালের সামুরাই সেনাপতি, রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলা বা সভাসদ্‌গণের জমকালো পোষাক ও প্রাচীন যুগীয় সাজ-সজ্জার আওতার মধ্যেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। ঐ যুগের সেনাপতি-

গণকে আধুনিক ফ্যাশনের মিলিটারী পোষাক পরাইলে কিম্বা মহিলাগণকে য়ুরোপীয় ধরণের ফ্রককোট, হেট পরাইলে কাবুকীর স্বকীয় সৌষ্ঠব ও মাহাত্ম্যটুকু মাটি হইয়া যায়—ইহা হবে একটা হাস্যাস্পদ অনুকরণ; বাস্তব পক্ষে সামুরাই যুগের আবহাওয়া বা ফ্যাশনের সঠিক অনুকরণে থিয়েটার হবে না। তারপর কাবুকীর নিজস্ব কথাবার্ত্তার ভঙ্গী ও নাটকীয়ত্বের মধ্যে যে মহিমান্বিত ভাব ও সুসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহাকেও বিদায় করা যায় না।

তবুও মনে হয় কিকোগোরো তাহার কল্পনাতীত সৃষ্টি-প্রতিভার মায়ার পরশে পুরাতনকে দিতে পারিবেন নূতন জীবনের আস্বাদ, আর তার অভাবনীয় চাঞ্চল্য এবং গতি। পুরাতনের অসাড়, একঘেয়ে জীবনধারায় তিনি চান আধুনিক জীবনধারার প্রবল স্রোত বহাইতে।

তাহার অভিনীত "A hundred-yen-prize on his head" নাটকখানা তাহার নূতন প্রচেষ্টার জ্বলন্ত উদাহরণ। মানব জীবনের দুঃখ-নিংড়ানো করুণ রস, মানুষের বোকামি ও পাগলামি এই নাটকের মধ্যে নূতনভাবে রূপায়িত হইয়াছে। যে সব অভিনেতা এই নাটকে অভিনয় করিয়াছে তাহারা [illegible]দিম-যুগীয় কাবুকীর অভিনেতা হইতে এক তিলও ভিন্ন নয় তাহাদের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া। কিন্তু তাহারা পুরাতন রং ঢংয়ের অভিনয়ের মধ্যে দিয়াছেন নূতনত্বের ও আধুনিকতার সজীবতা।

* * * *

দুইজন চোর কি জানি কি ভাবিয়া একদিন হঠাৎ প্রতিজ্ঞা

করিয়া বসিল তাহারা আর চুরি করিবে না। কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে হয়ত তাহাদের সুপ্ত চেতনা ও বিবেক-বুদ্ধি তাহাদের মনের কোণে চুপি মারিয়াছে—আইনের চোখে ধূলি দিয়া তাহারা আর এটা সেটা চুরি করিয়া বেড়াইবে না। * * দশ বৎসর পর আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল আসাকুসা মন্দিরের নিকট একটা গাছের তলে। তখন জানা গেল ইহাদের একজন গুপ্ত পুলিস ও অন্য একজন কি এক সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী। যে তাহাকে ধরিয়া দিবে তাহাকে প্রচুর বখ্‌শিস দেওয়া হইবে—একথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সে আসিয়াছে বহুদূরের এক টাউন হইতে পুলিসের চোখে ধূলি দিয়া। ব্যাপার খুব বড় রকমের কিছু নয়। কিন্তু কিকুগোরোর নিখুঁত অভিনয় ইহাকে করিয়া তুলিয়াছিল দর্শকদের কাছে বাস্তবিকই উপভোগ্য। পূর্ণ একটি মাস অভিনয় চলিয়াছে, আর লাখে লাখে লোক কিকুগোরোর অনবদ্য, প্রতীভাদীপ্ত অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে আর ভাবিয়াছে, কাবুকী প্রাচীন-পন্থী বলিয়া যে বদনাম তাহা আজ ঘুচিল।

আশ্চর্য্য অভিনেতা এই কিকোগোরো, রঙ্গমঞ্চে তিনি যাদুকরের মত বিভিন্নরূপ চরিত্রের অভিনয় করিতে পারেন—এক সময় বাটপাড়, জুয়াচোর, একসময় টাউনের চতুরলোক বা ভীষণ সাহসী যোদ্ধা—যে কোন চরিত্র তিনি অতি দক্ষতার সহিত সূক্ষ্ম নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনয় করিতে পারেন। নিতান্ত নীরস অসাড় কাঠখোট্টা বিষয়-বস্তু ও তাহার যাদুর কাঠির পরশে হইয়া উঠে মনোমদ, জীবন্ত এবং চাঞ্চল্যকর। তাহার অভিনয়

হয় খুবই বাস্তবঘেষা—অভিনয়ের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটিও সূক্ষ্ম ব্যাপার হইয়া উঠে মূর্ত্তিমান—দর্শকগণ তাহা দেখিয়া স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ ভোগ করে। তাহার অভিনয় বাস্তবতার নিখুঁত ছবি বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা মোটেই নাই—খুব সহজ স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে অভিনয় করেন তিনি। তাহার বিপুল স্বাস্থ্য ও সুগঠিত পালওয়ান-সুলভ দেহ হয়ত অন্যের বেলায় অভিনয়ের বাঁধা স্বরূপই হইত কিন্তু তিনি এই দেহ ও স্বাস্থ্য নিয়াই এক সময় খুব পাতলা চেহারার ভঙ্গীমা সৃষ্টি করিতে পারেন—আবার অন্য সময় অন্য আকার ধারণ করিতে পারেন—ঠিক যেখানে যেমনটী দরকার। এসব লীলা যাদু ছাড়া আর কি!

দুই বৎসর বয়সের সময় ইনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন তাহার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে। তাহার বংশের তিনি এখন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাহার বাপ দাদা সকলেই অভিনেতা ছিলেন।

সিনেমা

অন্যান্য দেশের মত জাপানেও সিনেমার দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য দেশের মত নির্ব্বাক ছবিরই আদর ছিল সেখানে বেশী। ১৯৩১ সনে মাত্র ৩।৪টী সবাক ছবি উৎপন্ন হইয়াছিল, যথা—Lullaby, Farewell, Silent flower ইত্যাদি। কিন্তু কোনটারই তেমন আদর হয় নাই, কারণ ইহাদের মধ্যে এমন কোন মৌলিক বা প্রশংসনীয় উপাদান ছিল না যাহাতে লোক আকৃষ্ট হয়। এত কম সংখ্যক সবাক চিত্র উৎপন্ন হওয়ার

অন্যতম কারণ—সেখানে তখন যন্ত্রপাতির অভাব ছিল খুব বেশী। আর বিদেশ হইতে আমদানী করা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ফিল্‌ম উৎপন্ন করা বহু ব্যয়সাধ্য, কাজেই লাভজনক নয়। জাপানের যখন নিজস্ব ফিল্‌ম ছিল না তখন বিদেশীরা সুযোগ পাইয়া সবাক ছবি সেই দেশে রপ্তানি করে, যথা—All quiet on the western front, Love parade, Blue angel, The last company, Dishonoured (Paramount) ইত্যাদি বিদেশী ছবি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শচীকু কোম্পানী থিয়েটার এবং সিনেমার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় শক্তিশালী। এই কোম্পানী সর্ব্ব-প্রথম দুঃসাহস করিয়া সবাক চিত্র উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়। তাহাদের উৎপন্ন ছবি Madam and wife খুবই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং জাপানে উৎপন্ন অন্যান্য দুই একটি সবাক ছবির মধ্যে ইহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সনে জাপানে ৪০০ শত ফিল্‌ম উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে ৬১টী সবাক ৪০টী মিশ্রিত ধরণের। ঐ সনেই Nippon Film Distributors' Company গঠিত হয়। শচীকু কোম্পানীর হাতে এই নূতন কোম্পানীর জন্ম লাভ হইয়াছে। নিকাৎসু (Nikkatsu) ফিল্‌ম কোম্পানী জাপানের সর্ব্বপ্রথম ও প্রাচীন ফিল্‌ম কোম্পানী। শচীকু কোম্পানীর সঙ্গে ইহাদের প্রবল প্রতিযোগিতা।

১৯২৩ সনের ভূমিকম্পে টোকিয়োর সকল ফিল্‌ম ষ্টুডিও (Film Studio) ধ্বংস হইয়া যায়। তখন বাধ্য হইয়া

জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োতা (Kyoto) সহরে এই সব ষ্টুডিও স্থানান্তরিত হয়। পরে যখন টোকিয়ো সহর পুনর্নিম্মিত হয় তখন আবার জাপানী সভ্যতা ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল এই নগরীতে ষ্টুডিও নূতন করিয়া স্থাপিত হয়। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল টোকিয়ো সহরে একটা (Film Museum) স্থাপিত হইয়াছে। টোকিয়ো কিংবা টোকিয়োর আশে পাশে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন কোম্পানী তাহাদের ষ্টুডিও স্থাপন করিয়া ফিল্‌ম উৎপাদন করিতেছে। ইতিমধ্যে জাপানী যন্ত্রপাতিরও খুব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কাজেই মনে হয় জাপানের সবাক ছবির ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ এবং উজ্জ্বল।

জাপানে যে সব ফিল্‌ম তৈয়ারী হয় তাহার গল্পাংশ কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প হইতে নেওয়া। ফিল্‌মের জন্য খরচ করিয়া কোন মৌলিক গল্প লেখিবার লোক নাই সেখানে। ১৯৩৪ সনে যে সব ফিল্‌ম উৎপন্ন হইয়াছে তাহার শতকরা ৭০টী গল্প কোন দৈনিক বা অন্য সাময়িক পত্রিকায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া জাপানী পত্রিকাগুলি ফিল্‌মের গল্পাংশের খবর পূর্ব্বাহ্নে পাঠক সমাজকে দিয়া খুব একটা বড় কাজ করে। গল্পের সারাংশের সঙ্গে তাহারা ছবি দেখিতে আসিবার পূর্ব্বেই পরিচিত হয়। ইহাতে দর্শকের সংখ্যা সাধারণতঃ একটু বেশী হইবার কথা। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এখন আর বেশী ফিল্‌ম তৈয়ারী হয় না। ইহার কারণ ঐতিহাসিক ফিল্‌মের মধ্যে আছে একটা মামুলী ধরণের কায়দা এবং ভাবভঙ্গী আর বিশেষতঃ সেখানে বিষয়-বস্তুর

ঐশ্বর্য্য মোটেই নাই। ১৯৩৪ সনের রিপোর্টে দেখা যায় ঐতিহাসিক ফিল্‌মের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ধরণের ফিল্‌মের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আধুনিক ধরণের যে সব ফিল্‌ম বেশী জনপ্রিয় ঐগুলির মধ্যে আছে একটা ভাব প্রবণতার বিলাস এবং অতিরিক্ত ছড়াছড়ি। জাপানী মন হয়ত ইহাতে খুব আনন্দ উপভোগ করে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ফিল্‌ম—নূতন সমস্যা বা নূতন চিন্তাধারার প্রতীক—খুব বেশী আদর পায় না সেখানে।

১৯৩৪ সনে ৩২০টী বিদেশী ফিল্‌ম জাপানে আমদানী করা হইয়াছিল। ইদানীং ওসাকা টাউনে দুইটা প্রকাণ্ড সিনেমা-ঘর তৈয়ারী হইয়াছে। ইহারা আমেরিকা ও য়ুরোপ হইতে অসংখ্য ছবি আমদানী করিয়া থাকে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী গল্প জাপানে আদর পাইতে থাকিবে।

জাপানী আর্ট

জনৈক ভ্রমণকারী বলেন, "কিছুকাল সচেতনভাবে মিকাডোর রাজ্যে বাস করিলে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে আর্টই জাপানের প্রাণ। জাপানের ওঠা বসায়, চলাফেরায় পোষাক-পরিচ্ছদে এবং গৃহের মধ্যে, তার প্রতি দিনের জীবন-যাত্রায় এমন একটী শোভন ও সুকুমার শ্রী বর্ত্তমান, মনে হয় যেন দেশটী একখানি সুরচিত আলেখ্য।" নিতান্ত ছোটখাটো, খুঁটীনাটী জিনিষের মধ্যেও জাপানীদের শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। চা তৈয়ারীর অনুষ্ঠান, ফুলের স্তবক সাজান, আদব কায়দা, বাঁশের-তৈয়ারী শিল্প দ্রব্য, মাটির বাসন, ঘর দরজা, রুমাল, ছাতা এমন কি একটা সামান্য ফিতা—প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায় শিল্পীর হাতের ছোঁয়া। জাপানীদের মুখের চেহারায় expression নাই। তাই বুঝি আর্টের মধ্যে তাহাদের মনের expression এতো সুন্দর হয়! আর্টের ক্ষেত্রে জাপান এখন নূতন পথের সন্ধানী। আর্টে আধুনিকতম আদর্শ তথা পাশ্চাত্য আদর্শ কতটুকু জাপানী আর্টের আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় ইহাই বর্ত্তমান যুগের অন্যতম সমস্যা। প্রাচ্যের আদর্শবাদ যে সৌকুমার্য্য ও কমনীয়তার ভিত্তি তাহাই হইল পুরাতন জাপানী আর্টের স্বরূপ। চিরাচরিত জাপানী আর্টের পরিকল্পনা বজায় রাখিয়া আধুনিক আর্টিষ্ট সম্প্রদায় কি ভাবে নূতন ছন্দের ছবি আঁকিতে পারে সে বিষয় নিয়া অনেকেই মাথা

ঘামাইতেছেন। আর্টের রাজ্যেও এখন স্বাজাতিকতা এবং আন্তর্জ্জাতিকতার লড়াই সুরু হইয়াছে। একদল আর্টিষ্ট মনে করেন যে আন্তর্জ্জাতিক আদর্শের একীভূত পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়া জাপানী আর্টিষ্ট নিজেদের জাতীয় ছন্দকে বাদ দিতে পারে না। অন্য কথায় আর্টের আন্তর্জ্জাতিক আদর্শ ও পরিকল্পনা যাহাতে জাপানের নিজস্ব আদর্শ ও পরিকল্পনাকে কোন অংশে ক্ষুণ্ণ না করিতে পারে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। অন্য সকলে জাপানী আর্টের আদর্শবাদকে অনুকরণ করিবে ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের ইচ্ছা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মিঃ ইয়কোয়ামার রিপোর্টে। ১৯১৯ সালে প্যারিসে জাপানী চিত্রকলার এক বিরাট প্রদর্শনী হয়, পরের দুই বৎসর যথাক্রমে রোম এবং বার্লিনে ঐ প্রদর্শনী খোলা হয়। বেরণ ওকুরা রোমের প্রদর্শনীর সকল খরচ বহন করেন। জাপানী চিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য যেরূপ ঘর এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে চিত্র সাজানো দরকার রোমের প্রদর্শনীতে বহু টাকা ব্যয়ে সেরূপ আদর্শ ঘর তৈয়ারী হইয়াছিল। এ স্থলে ঐ প্রদর্শনীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইয়কোয়ামার রিপোর্ট হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করা যাক। তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য আর্ট তাহার সচল, সজীব ভাব হারাইয়া বর্ত্তমানে একটা অসাড় অকর্ম্মণ্যতার সম্মুখীন হইয়াছে একথা অনেকের মুখে শোনা যায়। রোমে যখন প্রদর্শনী চলিতেছে তখন আমি প্যারিসের অনেক চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ করিয়া নিয়াছি। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মিয়াছে যে হয়ত এই উক্তির মূলে কিছুটা সত্য আছে। পাশ্চাত্য আর্ট বাস্তবতামূলক এবং আর্টের বিষয়-বস্তুকে পাশ্চাত্যের আর্টিষ্টগণ নিছক বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়াই পর্য্যবেক্ষণ করে। সে পর্য্যবেক্ষণ অনেকটা বস্তু-সাপেক্ষ (objective); পক্ষান্তরে প্রাচ্যের আদর্শবাদ আমাদের আর্টের জীবনী-শক্তি যোগায় এবং আমাদের আর্টিষ্টগণ চিত্রের বিষয়-বস্তুকে পর্য্যবেক্ষণ করে প্রকৃত আদর্শবাদীর দৃষ্টি দিয়া—সে দৃষ্টি বস্তু-নিরপেক্ষ (subjective), আর্টিষ্ট দ্রষ্টার মনের যে গতি বা তৎকালীন যে অবস্থা তাহাই প্রতিফলিত হয় আর্টের বস্তুর উপর। কাজেই তাহার চোখে ঐ বিশেষ বস্তু একটা নূতন স্বরূপ নিয়া প্রকাশিত হয়।”

“জাপানীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়ত্বকে যদি আর্টের মধ্যে বাস্তব রূপ দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাদের আর্টের ভবিষ্যৎ দিগন্ত-প্রসারী রাজপথের মতই অসীম ও অনন্ত। তখন বিদেশীরাও আমাদের আর্টের মধ্যে এমন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইবে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতকাল হয়ত তাহারা কোন খোঁজই রাখে নাই;—এক কল্পনাতীত রঙ্গীন জগত তাহাদের চোখের সামনে তখন ভাসিয়া উঠিবে।”

যাহারা মিঃ ইয়কোয়ামার চিন্তামার্গের পথিক তাহারা রক্ষণশীল দলভুক্ত। আর্টে জাপানী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার যে দাবী তাহার মধ্যে কোথাও হয়ত কোন গলদ রহিয়া গিয়াছে। এই ধরণের মত নিতান্ত গোঁড়ামির পরিচায়ক আর ইহার পিছনে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি নাই।

এই দলের পাশাপাশি আর একদল আছে। ইহাদের চেয়ে অনেক বেশী উদারনৈতিক এবং জাপানী জাতীয়তা ও স্বকীয়ত্বের বৈশিষ্ট্যের যে স্বরূপ সে সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা খুব সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। আন্তর্জ্জাতিকতার পাষাণ ভিত্তির উপর বীরের মত দাঁড়াইয়া আধুনিক জগতের গতিবিধি সচকিতভাবে লক্ষ্য করার যে একটা আবশ্যকতা আছে ইহা তাহারা স্বীকার করেন। পুরাতন জাপানী আর্টের রীতিনীতি, এবং পরিকল্পনাকে ঘষিয়া মাজিয়া ইহাকে আন্তর্জ্জাতিক রং ও রূপ দিবার পক্ষপাতী ইহারা।

জাপানী চিত্রকে মোটামুটী দুই ভাগে ভাগ করা যায়—পুরাতন এবং নূতন। প্রথম শ্রেণীর চিত্রের বিষয়-বস্তু, মাল মশ্‌লা, টেকনিক সবই পুরাতন ধরণের। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রে পাশ্চাত্যের ছাপ খুব বেশী। এই সব চিত্রে পাশ্চাত্য ধরণের মাল মশলা এবং টেকনিক ব্যবহৃত হয়। এই দুই শ্রেণীর আর্টিষ্টদের মধ্যেই আবার স্বাজাতিকতা ও আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শ নিয়া মামুলী বিরোধ লাগিয়া আছে।

বয়োবৃদ্ধ চিত্রকরগণ স্বাজাতিকতার পক্ষপাতী; তাহারা প্রাচীন রীতিনীতিরই ভক্ত। কিন্তু Imperial Academy of Art-এ যে সব চিত্র দেখানো হয় তাহাদের মধ্যেও স্পষ্ট ধরা পড়ে আন্তর্জ্জাতিকতার ইঙ্গিত। মিঃ ইয়াজাওয়া এবং মিঃ শকো কাওয়াসাকীর (Mr Shoko Kawasaki) অঙ্কিত পাশ্চাত্য টেকনিকের ছবি, যথাক্রমে ‘সেই কানো সান’ (Praise of midsummer) এবং ‘কোদামা’ (echo) তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। এই সব ছবি দেখিয়া একটা নির্ভুল ধারণা হয় যে

আর্টে জাতীয়তাবাদীরা আন্তর্জ্জাতিকতাবাদীর সঙ্গে তুলনায় কিরূপ দোটানা মুস্কিলে পড়িয়াছে।

শুনযোকাই (Shunyo-kai) পাশ্চাত্য টেকনিকের সাহায্য নিয়া যাহারা ছবি আঁকে তাহাদের একটা সমিতি। এই সমিতির বিশিষ্ট সভ্য মিঃ কোয়ামা (Koyama) এবং মিঃ হাজামা পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুসারে ছবি আঁকিতে শিখিয়াছেন। অবশ্য এ কথা মনে কারলে ভুল হইবে যে, এই সমিতির লক্ষ্য ও আদর্শ পাশ্চাত্যমুখী। আর্টের প্রাচ্য-আদর্শ ও রুচির প্রমাণ এই সমিতির সভ্যগণের অঙ্কিত ছবিতে বহুলভাবে বিরাজমান।

টোকিয়ো সহরে অনেকগুলি আর্ট স্কুল আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ছবির ভিন্ন ভিন্ন মৌসুমে প্রদর্শনী হইয়া থাকে। Imperial Academy of Art, The Nippon Bijut Suin (Japan Academy of Art), The Nikakai, Shunyokai ইত্যাদি বহু আর্ট কেন্দ্র সেখানে আছে। প্রদর্শনীতে যদি কোন সভ্যের অঙ্কিত ছবি দেখানো না হয় তবে তিনি খুব মনঃপীড়া ভোগ করেন, কারণ প্রদর্শনীতে দেখাইতে পারিলেই আর্টের ক্ষেত্রে তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়ে। প্রদর্শনীর ছবি নির্ব্বাচন কমিটির মতামত তাহারা খুব ধীর স্থিরভাবে বিচার আলোচনা করিয়া দেখেন এবং তদনুযায়ী সাধারণের রুচি মাফিক ছবি আঁকেন যাহাতে দ্বিতীয় বার তাঁহাদের ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। অবশ্য জনসাধারণের রুচির তাগিদে ছবি আঁকিতে গিয়া তাঁহারা আর্টের অবমাননা

করেন না। জাপানী আর্ট তাহার বিশিষ্ট গৌরবের আসন হইতে সহজে নামিবার পাত্র নয়!

খাঁটী জাপানী ও খাস পশ্চিমা এই দুই আদর্শের মধ্যে যে লড়াই সুরু হইয়াছে তাহার পরিণাম কি হয় এখনও বলা যায় না। আর্টের ক্ষেত্রে এই দুই বিভিন্ন মুখী স্রোতোধারার শেষ পরিণতি কোথায় কে বলিবে? তবে এইটুকু বলা যায় যে দুই শ্রেণীর মধ্যেই অনবদ্য নিখুঁত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটার চেয়ে কোনটা সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে, পরিকল্পনায়, ভাবব্যঞ্জনায় বা নিখুঁত আদর্শবাদের দিক দিয়া নিকৃষ্ট নয়। প্রত্যেকটা ছবি আর্টের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন।

১৯৩৪ সনে টোকিয়ো সহরে অনেকগুলি Art exhibition হয়। বুদ্ধ শিণ্টো সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও জাপানী কৃষ্টির কল্যাণকামী কাবো দাইশীর (Kobo Daishi) মৃত্যুর একাদশ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাপানের যুবরাজের জন্মোপলক্ষে Tokyo Fine Art Gallery-তে ১৯৩৪ সনের এপ্রিল মাসে এক বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। জাপানের যত আর্ট সম্পদ এই প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়াছিল। ঐ সনের অক্টোবর মাসে Tokyo Imperial Household Museum-এ জাপানের প্রাচীন যুগের খোলসের (মুখাভরণ) এক বিরাট প্রদর্শনী হয়। জাপানের এই সব খোলসের মূল্য আর্টের দিক দিয়া খুব বেশী। নানা জাতীয় প্রায় ২০০ শত খোলস জাপানের নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করা হয়।

শিণ্টো এবং বৌদ্ধ মন্দিরে যে সব আর্টের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে সেগুলি সরকারীভাবে রক্ষার জন্য ১৮৯৭ সনে সর্ব্ব প্রথম এক আইন পাশ করা যায়। ১৯২৯ সনে আর এক আইনের বলে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারে যে সব আর্টের নিদর্শন রহিয়াছে সেগুলিও সরকারীভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কোন এক প্রদর্শনীতে প্রায় ১২০০ শত জাতীয় আর্টের মূল্যবান সম্পদ ও নিদর্শন দেখানো হয়।

জাপানে প্রতি বৎসরই নীলামে অনেক ছবি ও অন্যান্য আর্টের নিদর্শন-বস্তু বিক্রী হয়। ১৯৩৪ সনে বেরণ ফুজীটা ২১ লক্ষ ৩০ হাজার ইয়েন মূল্যের ছবি বিক্রয় করেন। টোকিয়ো আর্ট ক্লাবে ১৯৩২ সনে বহু সুন্দর ছবি নীলামের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক নামজাদা আর্টিষ্টের ছবি নীলাম হয়। তিন দিনের মধ্যে ১৭টী ছবির দাম উঠে ৯০ হাজার ইয়েন পর্য্যন্ত। কিন্তু পরে প্রমাণ পাওয়া গেল যে এই সব ছবি আসল নয়; কোন জুয়াচোর শিল্পীর হাতে আঁকা নকল ছবি মাত্র। প্রকৃত শিল্পীর হাতের পরশ এগুলির মধ্যে ছিল না। ব্যাপারটা পুলিশের হাত পর্য্যন্ত গড়ায়।

জাপান-রাজদরবারে একদল বিশিষ্ট শ্রেণীর আর্টিষ্ট আছেন। জাপানী ষ্টাইলের ছবি কিংবা পাশ্চাত্য ষ্টাইলের ছবি আঁকিবার জন্য বিভিন্ন আর্টিষ্ট রাজদরবারে স্থান পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য জাতীয় আর্টিষ্টও সেখানে আছেন, যথা—ভাস্কর্য্য শিল্প, মৃৎপাত্র-শিল্প ইত্যাদি নানা শিল্প পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য সেখানে কয়েক জনের স্থান হইয়াছে। এখানে কয়েকটী বিশিষ্ট নামজাদা ছবির বিষয় আলোচনা করা যাক্!

মুকুকাই-এর অঙ্কিত ছবি "Evening Bell of a Distant Temple" টোকিয়ো আর্ট ক্লাবের ১৯৩৪ সনের প্রদর্শনীতে খুব সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। মিঃ কাওয়াবাটার অঙ্কিত 'Fish Pattern' একটা সুন্দর ছবি। কোন এক প্রদর্শনীতে ইহাকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ইহা প্রাচীন জাপানী ষ্টাইলের ছবি।

১০০০ খৃষ্টাব্দে মুরাসাকী শিকিমু নাম্নী এক মহিলা ৫৪ ভলুমে একখানা বিরাট বই লেখেন—বই এর নাম গেঞ্জি মনোগাতারী (Genji Monogatari)। অভিজাত, কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ যুগে প্রেমলীলার স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন লেখিকা এই বিরাট বই খানিতে। জাপানীরা এই বই খানির খুবই ভক্ত, ইহাকে তাহারা পূজার বস্তুর মতোই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কত উৎসাহ আনন্দের সহিতই না তাহারা ইহা পড়ে! ফুজিওয়ারা (Fujiwara) যুগের সুষ্ঠু নিখুঁত আচার-ব্যবহার, অনুপম সুন্দর ভাববিলাস এবং রোমান্স (প্রেমাভিনয়) লেখিকা লিরিক (গীতি) ছন্দে অতি সূক্ষ্ম এবং চিত্তহারী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ আর্থার ওয়ালী এই বইখানা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। প্রাচীন সাজ-সজ্জাবহুল ইয়ামতো নামক জাপানী চিত্রের অফুরন্ত মালমশলা যোগাইয়াছে এই বইখানা। মার্কুইস টকোগাওয়া এবং টোকিয়োর বেরণ মাসুদার নিকট এখনও যে চারিখানা ছবির আলেখ্য আছে তাহার মধ্যে ঐ বইখানার বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া অঙ্কিত যে ছবিগুলি আছে ঐ গুলি জাপানী চিত্রের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত। এই ছবিগুলি

যতদূর সম্ভব ১১৫০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হয়। তাহার পরেও ঐ বইখানাকে কেন্দ্র করিয়া ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। বইয়ের দশম অধ্যায়কে চিত্রের মারফত রূপায়িত করিবার জন্য 'সাকাকী' (পবিত্র বৃক্ষ) নামক ছবিখানা আঁকা হইয়াছে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে। বই এর নায়ক হীকারু গেঞ্জী (জাপান রাজ-বংশের জনৈক ব্যক্তি) কিয়োতোর নিকটে কোন এক যুবরাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। যুবরাজ্ঞী মন্দিরের পুরোহিত হওয়ার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় সাধনায় রত। মনপ্রাণ সম্পূর্ণ শুচি হবে, পাপের ছাপ তাহার সারা দেহে মনের স্থান পাবে না—ঠিক এমনি শুচিতা এবং পবিত্রতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত কোন্ সাহসে সে মন্দিরের পুরোহিত হবে? প্রাচীন জাপানের শান্ত সমাহিত ভাব, একটা শুচিতার আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় এই ছবি খানিতে।

মিঃ টাইকান ইয়কোয়ামা (Mr Taikan Yokoyama) জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। তাহার অঙ্কিত ছবি "সেই-সেই-রুতেন" (Sei-Sei-Ruten) মারকুইস হসোকাওয়ার (Morquis Hosokawa) ছবি-সংগ্রহের মধ্যে রক্ষিত আছে। ইহার সাইজ ৩০০ ফুট × ২ ফুট; দাম ২০।২৫ হাজার ইয়েনের কম নয়।

৫০ বৎসর পার হইলে জাপানীরা স্বভাবতঃ ভাবে তাহাদের দুনিয়ার দেনাপাওনা চুকাইবার সময় হইয়াছে; জীবনের জয় পরাজয় কৃতকার্য্যতা এবং অকৃতকার্য্যতার একটা হিসাব নিকাশ করা দরকার। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত জাপানও আধ্যাত্মিকতার দেশ। মানব জীবনের নানা দার্শনিক তত্ত্ব, ইহার অনিত্যতা

ও অসারতা চিররহস্য জালে আবৃত। ইহার উৎপত্তি, গতি এবং পরিণতি জাপানী কবি ও আর্টিষ্টকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে ?"

জাপানী কবি বলেন –

Man's span but fifty years !
And shameful ! nothing done.
For blossomed tree, spring past
And half the summer run.

অনুবাদ—এ জীবন, পঞ্চাশের বেশী নয় আয়ু তার,
কি লজ্জা ! হলো না যে কিছুই আর !
ফুটলো গাছে ফুল বসন্তেরি হাওয়ায়
গ্রীষ্মের আমেজ যে লেগেছে গায়।

আর্টিষ্ট তাহার তুলির সাহায্যে জীবনের জটীল গতি, ইহার নানা সমস্যা, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ছবি আঁকেন। মিঃ তাইকান তাহার 'সেই—সেই-রুতেন' ছবিখানিতে ঠিক এই বিষয়বস্তুরই অবতারণা করিয়াছেন। মোটামুটীভাবে ছবির অর্থ এই—জীবনের ভবঘুরে গতি, ইহার আনন্দ ও ব্যথা-রাঙা ছবি, পদে পদে উত্থান পতন, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তার গতি ও পরিণতি—এক কথায় জীবননদের উৎপত্তি কোথায় কোন্ এক রহস্যময় অচিন মায়াপুরীতে, কোথায়ই বা তার শেষ ; জীবনের রহস্য, হাসি-কান্না এবং তার মেঘ রৌদ্রের খেলা—ইত্যাদি হইল মিঃ তাইকানের ছবির বিষয়বস্তু।

একটা ক্ষুদ্র জলস্রোত টপ্ টপ্ করিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া তাহার পথ করিয়া চলিয়াছে আর উপরে বিরাজমান চির হরিৎ গাছ পালা, লতাগুল্মের ঝোপ ; তারা যেন পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া কোলাকুলি করিতেছে। সাদা কালির পোছ দিয়া আর্টিষ্ট এই স্রোতোধারার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ তাইকান ছবি আঁকিতে গিয়া আঁকঝোকের বাহুল্য পছন্দ করেন না। আধুনিক পন্থী আর্টিষ্টগণ ছবিতে খুঁটীনাটির বাহুল্য ও তাহা ফুটাইয়া তুলিতে যে টেকনিকের আশ্রয় নেন মিঃ তাইকান তাহার পক্ষপাতী নহেন। রংচঙ বা অন্য কোন বাহুল্যের তিনি দাসত্ব করেন না। এই ছবিখানিতে তিনি তুলির কয়েকটি মোটা রকমের আঁচড় দিয়া পাতলা আবছা রং এবং টাটকা তাজা সবুজ রংএর যে সূক্ষ্ম মিলন ঘটাইয়াছেন তাহাতে জীবনের রহস্যাবৃত উৎসমূলে একটা পবিত্রতার ছাপ পড়িয়াছে। জীবনস্রোতের উৎসমূলের এই প্রাথমিক অবস্থা দেখিলে দর্শকের মনে একটা টাট্‌কা সতেজ পবিত্র ভাবের ছাপ লাগে।

সারি সারি পাহাড়ের শ্রেণী—পাহাড়ের গায়ে ফাঁকে ফাঁকে বৃক্ষলতা-বহুল উপত্যকা—আর্টিষ্ট তাহার কাল কালির তুলির এমনি অপরূপ কারসাজি করিয়াছেন যে গাছপালা আর পাহাড়ের শ্রেণী যেন একেবারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী কাল কালির কী বিচিত্র বাহার ! একই কালি কত বিভিন্ন স্তরে রংএর ছায়া প্রতিফলিত করিতে পারে ! প্রভাতের সূর্য্যকিরণকে যখন এই গাছপালা এবং পাহাড়ের শ্রেণী অভিবাদন জ্ঞাপন করে তখনকার সে দৃশ্য—গাছের তাজা সবুজ রং আর পাহাড়ের

কমলার মতো লাল রংএর ঝলক—আর্টিষ্ট তার তুলির আঁচড় কাটিয়া কী জীবন্ত ও সতেজভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! ধন্য তাহার তুলির কারসাজী!

এক জায়গায় জলস্রোত বা জীবনস্রোত কতগুলি কুঁড়েঘরের আড়ালে পড়িয়াছে। মনে হয় যেন আর্টিষ্ট শিশুমনের অবচেতনার রাজ্যে যে মানুষটী গোপন নিঃশব্দে অথচ তীব্র সতেজ-ভাবে দিনের পর দিন পূর্ণ মানুষটী হইতে চলিয়াছে তাহাই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কী সার্থক তাঁহার চেষ্টা, কত সুস্পষ্ট এবং মুখর এই ইঙ্গিতটুকু! ছবি নয় যেন বাক্‌পটু মানুষ!

ক্ষুদ্র জীবনস্রোত এখন যৌবনের স্বাভাবিক উদ্দামতা ও উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছে; তাহার অফুরন্ত জলরাশি প্রবল বেগে দুই কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিলীয়মান কুয়াশার পর্দ্দার শেষ রেখাটুকু ভেদ করিয়া একটা নৌকা তীরবেগে অনন্তের পানে গড়াইয়া চলিয়াছে—ঠিক এমনি একটা দৃশ্যের সঙ্গে এখন জীবননদের মতিগতি তুলনা করা চলে। নৌকার গতি বেপরওয়া; ক্রমে সে কুয়াশার পর্দ্দা ভেদ করিয়া স্পষ্ট দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিতে চলিয়াছে। আর্টিষ্টের পরিকল্পিত যে স্রোতো-ধারায় এখন যৌবনের বান ডাকিয়াছে তাহারও হাবভাব, মেজাজ ঠিক তেমনি।

মিঃ তাইকান হেয়ালির অন্তরালে লুকানো, রহস্যাবৃত, বিষয়-বস্তুর ধারণা ও তাহাকে ছবির মধ্যে বাস্তবরূপ দিতে সিদ্ধহস্ত। কুয়াশা, কুজ্ঝটীকা, মেঘ এই সব রহস্যের প্রতীকগুলি তিনি

অতি দক্ষতার সহিত ছবিতে রূপায়িত করিতে পারেন—দক্ষ যাদুকরের মতো তিনি এইগুলিকে নিয়া আজব খেলা খেলিতে পারেন। তাহার তুলি এবং কালির মধ্যে ইহারা ইহাদের স্বকীয় স্বাভাবিক আবছা রূপ পায়—কোথাও কোন কিছু জমাট বাঁধে না, আড়ষ্ট হইয়া থাকে না।

ফুজীয়ামা (অমর) জাপানের পবিত্র পর্ব্বত—অনন্ত রহস্যাবৃত এই পর্ব্বতের আবহাওয়া। মিঃ তাইকান ফুজীয়ামার যে সব ছবি আঁকেন তাহা তাহার তুলির অনবদ্যস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠে। ফুজীয়ামার আশে পাশে মেঘের খেলাকে তিনি বাস্তবতার রূপ দিয়াই ক্ষান্ত হন না, জীবনের নৃত্য এবং স্পন্দনের আভাস পাওয়া যায় এই প্রাণহীন মেঘলোকে তাহার তুলির যাদুতে। ফুজীয়ামার ছবি-গুলি তাহার শ্রেষ্ঠ দক্ষতা ও অতুলনীয় দৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

পাহাড় পর্ব্বত, গাছ পালা, নদীর উপর সেতু, জলস্রোত বা স্রোতাবর্ত্ত—এইগুলি তিনি একমাত্র কাল কালির সাহায্যেই ফুটাইয়া তোলেন। কালির কি মোহিনী শক্তি—কী তার মায়ার পরশ! একরঙা ছবির মধ্যেই চোখে পড়ে নানা বিচিত্র রং-এর খেলা আর ভাবছন্দ! মিঃ তাইকানের ধারণা ও কল্পনার মৌলিকত্ব ও তুলির পরশ প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সহজ সুন্দর করিয়া তোলে দর্শকের চোখে। যে কেহ তখন তাহার সেই ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। সে ছবির সৌন্দর্য্য ও আর্টিষ্টিক মূল্য উপলব্ধি করিতে বিশেষজ্ঞের দরকার পড়ে না।

তাহার ছবির মধ্যে পাওয়া যায় আধ্যাত্মিকতার স্বাদ বা ছন্দের নৃত্য। এইখানেই অন্য আর্টিষ্টদের সঙ্গে তাহার পার্থক্য—

সে আর্টিষ্ট হোকনা অতীতের না হয় বর্ত্তমানের ! এই ক্ষেত্রে তিনি একক, আকাশচুম্বী তাহার প্রতিভা ; সে প্রতিভাকে ম্লান করিতে পারে এমন আর্টিষ্ট জাপানে জন্মে নাই। তিনি নিজেই নূতন এক আর্টের ধারা বা পর্য্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পর্য্যায়ের তিনি নিজেই একচ্ছত্রাধিপতি। বর্ত্তমান যুগের বা সুদূর অতীতের অমর আর্টিষ্টগণ তাহার সর্ব্বজয়ী প্রতিভাকে এতটুকু ম্লান করিতে পারে নাই।

মিঃ তাইকান তাহার নিজের আর্টের আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া এবং পশ্চিমা টেক্‌নিক ও ষ্টাইলের মামুলী রীতি-নীতির দাবি অস্বীকার করিয়া বলেন, "চিত্রকরের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে ছবির মূল্য, ইহা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কাজেই চিত্রকরকে ট্রেইনিং দিয়া তৈয়ারি করার পূর্ব্বে গঠন করিতে হইবে তাহার অনবদ্য, আদর্শ চরিত্র। প্রাচ্যের আর্টের প্রকৃতি বা মজ্জাগত উপাদান যদি এই হয় তবে বর্ত্তমানে টোকিয়োর Fine Arts School কেন যে বৃথা পাশ্চাত্য আর্টের মোহে পড়িয়া জাপানী কায়দায় চিত্রাঙ্কণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বুঝা যায় না। জাপানী আর্টের জীবনীশক্তিটুকু তাহারা বলি দিতে চায় পাশ্চাত্যের বেদীতে। যে উন্নত প্রাণশক্তির সতেজ আলোর পরশে চরিত্র মহান ও উদার হয় তাহাকে বাঁচাইয়া রাখাই চিত্রকরের প্রধান ও প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। পূত, পবিত্র মহান প্রাণশক্তি কখনও অযোগ্য আর্টের নিদর্শন জন্মাইতে পারে না। চিত্রকর তাহার বক্তব্য বিষয়বস্তুকে খুব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করিয়া তোলেন তাহার তুলিতে। জাপানী চিত্র-

করের মতবাদ ও পরিকল্পনার অন্তরের অন্তঃস্থলের বস্তু হইল এই আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতায় তিনি বিশ্বাস করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন। অবশ্য জাপানী আর্টকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করার যে একটা পরীক্ষার তোড়জোড় চলিয়াছে তাহার সঙ্গেও পূর্ণ সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা থাকা দরকার। মোটের উপর চিত্রকর যাহা আঁকে—হোক দিগন্তরেখা, মধুভরা ফুলের উপর জীবনের চঞ্চল ব্যস্ততা বা মানুষের ছবি—প্রত্যেকটীর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় রহিয়াছে একটা অন্তর্নিহিত শক্তি—কিসের শক্তি? না আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের। এই ছবিতে পাওয়া যায় একটা সচেতন জীবনরসে ভরপূর শোধিত আত্মার সন্ধান।"

মিঃ তাইকান মোটেই একদেশদর্শী গোঁড়া আর্টিষ্ট নন। অন্তর তাহার উদার, বিশাল এবং দরদে ভরা। বিশ্বের সব কিছুকে সর্ব্বগ্রাসী দরদ দিয়া আপনার বলিয়া গ্রহণ করার মতো অন্তরের যে উদারতা তাহার আছে তাহা সম্পূর্ণ প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। তাহার অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলি তাহার জীবনাদর্শ ও জীবনবেদের গূঢ়তত্ত্বটুকু দর্শকের সামনে ধরে। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন, "ছবি দেখিয়া মনের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার জন্যই অনেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি কিনে কিন্তু একটা নিখুঁত দৃশ্য চিত্রপটে দেখিয়া তাহার সঙ্গে নিজের মনের যোগ ঘটাইতে বা তদনুযায়ী মনটাকে উন্নত ও মহত্তর করার চিন্তা হয়ত তাহাদের মনে জাগে না।"

মিঃ তাইকানের বয়স এখন ৭৫। তাঁহার উজ্জ্বল চোখ দুটো তাঁহার ব্যক্তিত্বেরই সাক্ষ্য দেয়। ব্যক্তিত্ব তাঁহার এমনি যে ইহার গতি

এক সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত, কোন অবস্থার সঙ্গে ইহা আপোষ করিয়া চলিতে পারে না আর এ সত্ত্বেও ইহা দরদের কড়া তাগিদে সর্ব্বদা সচকিত। তাহার বাড়ীখানাও যেন তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দোস্তি পাতাইয়াছে—এমনি আর্টিষ্টিক সেই বাড়ীখানা। মিঃ তাইকানের চোখে ব্যক্তিত্বের কদর খুব বেশী। বাস্তবিক আর্টিষ্ট যাহারা তাহারা নিজের ব্যক্তিত্বের গরজেই ছবি আঁকেন। ছবির মধ্যে তাহাদের সৃজন-শক্তি ও প্রতিভার বাহ্য স্ফূরণ দেখা যায়। সাধনা বলে তাহারা আর্টের নিত্য নূতন নিদর্শন সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সাধনা পথ চলিবে। এই রহস্যাবৃত পথে চলিতে পারিলেই অন্যান্য আর্টিষ্টগণ হয়ত মিঃ তাইকানের স্তরে পৌঁছিতে পারিবে।

মিঃ বাকুসেন সুচিদা (Mr Bakusen Tsuchida) ১৮৮৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সনে তিনি Imperial Academy of Artএর বাহিরে অন্য একটি আর্ট সমিতি গঠন করেন। এ কাজে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীয় চিত্রকরগণ বিস্তর সাহায্য করিয়াছে। ১৯২১ সনে তিনি ফরাসী দেশে যান। দুই বৎসর সেখানে থাকিয়া তিনি য়ুরোপীয় আর্ট শিক্ষা করেন। তিনি সম্প্রতি Imperial Academy of Artএর সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। তাহার নিজের সমিতি এখন আর নাই। Academy এর বয়োকনিষ্ঠ সদস্যদের তিনি অন্যতম। মাইকো (Maiko) অর্থ নর্ত্তকী বালিকার দল। ইহারা কিয়োতো অঞ্চলে সাধারণতঃ বাস করে। মিঃ বাকুসেন ইহাদের ছবি আঁকিতে সিদ্ধ হস্ত। নানা ভঙ্গীমায় তিনি ইহাদের ছবি আঁকিয়া থাকেন—

তাহার অতুলনীয় তুলির স্পর্শে ছবিগুলি হইয়া উঠে সকলের কাছে আনন্দদায়ক। ১৯১৪ সনে Imperial Academy এর প্রদর্শনীতে তিনি যে ছবিখানা দেন তাহাতে রহিয়াছে দুই জন 'মাইকো'—তাহারা স্বপ্নাবিষ্টের মতো এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন একটা পুকুরে প্রস্ফুটিত কাকিৎসুবাটা (Kakitsubata) ফুলের দিকে। ছবিখানিতে প্রভাতের একটা আবহাওয়া যেন ধরা পড়িয়াছে। একটী বালিকার বয়স ১৬ ও অন্যটীর প্রায় ১৫। মেয়ে নয় যেন দুটো পুতুল ধ্যানে নিরত। দর্শকেরা ইহাদের মেয়েলী রূপের তারিফ যত না করে তার চেয়ে বেশী করে ইহাদের পুতুল সুলভ রূপের ছটার।

ছবি আঁকিয়া জাপানীরা সন্তুষ্ট নয়। সেখানে আর্টের একটা মস্ত অঙ্গ 'ইকেনবো' (Ikenobo) বা ফুলের স্তবক রচনা। জাপানে অনেক প্রাচীন বংশ চিরাচরিত রীতিতে ফুল সাজানো ও চায়ের অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক আয়োজন শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের পৈতৃক ব্যবসা। প্রত্যেক বংশ এক একটা স্কুল খুলিয়া বসিয়া আছে। সেখানে ফুল সাজানো বা চা তৈয়ারীর আর্ট শিক্ষা দেওয়া হয়। গত ৪০০ শত বৎসর যাবৎ জাপানে 'ইকেনবো' রীতি চলিয়া আসিয়াছে। এই রীতিই নাকি সর্ব্বপ্রাচীন। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই রীতি চলিবার কারণ কি? সেখানে কোনও বৌদ্ধ মন্দিরে হয়ত একই বংশের লোক বংশানুক্রমিক ভাবে কিউরেটারের (Curator) কাজ করিয়া আসিয়াছে। আর এই উপার্জ্জিত আয় ঐ পরিবারের জীবিকার একমাত্র সম্বল। বংশানুক্রমিক ভাবে অনেক ব্যবসায়ই জাপানে চলে।

তার পর আর এক রীতির বিষয় এখানে আলোচনা করা দরকার। প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কিফু নিশিকাওয়া (Kyofu Nishikawa) কিফু রীতির প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ছিলেন বাঁশের বাঁশী বাদক। সে বাঁশীকে জাপানীরা বলে 'শাকুহাচি'। জেন (Zen) সম্প্রাদায়ের জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিত এই বাঁশীর আবিষ্কার করেন। বাঁশীর সুর অতি কোমল এবং মধুর—শ্রোতার মনে একটা শান্তির ভাব জাগায়। এই ভাবের আবেশকে বলা হয় 'জেনের আবেশ'। 'কিফু' রীতিতে ফুল সাজানোর যে আর্ট ইহার মধ্যেও পাওয়া যায় বাঁশীর সুরের মধুর ঝঙ্কার—প্রাণ-মাতানো আবেশ।

'ইকেনবো' রীতিতে অভিজাত সম্প্রদায় ফুলের স্তবক রচনা করে। আর সহর বাসীরা সাধারানতঃ 'কিফু' রীতিতে ফুল সাজাইতে ভালবাসে। 'ইকেনবো' এর বিশেষত্ব ইহার জটীলতা এবং অনুষ্ঠানের ঘটা। আর 'কিফু' এর প্রাণ-বস্তু সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব—বাড়াবাড়ি নাই ইহাতে। এই জন্যই বোধ হয় বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে দুই কায়দার আদর হইয়াছে। কোন অতিথির সামনে বাড়ীর মেয়েরা ফুলের স্তবক রচনা করে। সামনে তাহার ফুলদানী—ডানে ফুল রাখিবার একটা কাঠের ট্রে। ফুল সাজানো শেষ হইল আর ট্রেখানা ফেলিয়া দেওয়া হইল। কোন বিশেষ উপলক্ষ্য না হইলে চীনা মাটীর ট্রে ব্যবহার করা হয়। এইরূপ একই ট্রে বার বার ব্যবহার করা হয়। ফুলদানীতে ফুল সাজাইয়া ট্রের মধ্যভাগে স্থাপন করা হয়। ট্রের এক পাশে থাকে একটা কুঁজো—মুখটা গামছ।

চার ভাজ করিয়া বন্ধ করা হয়। জাপানীগণকে গ্রসেট নামক জনৈক জাপান বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যের গ্রীক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ জাপানীরা তাহাদের সুদুর্ল্লভ নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিতে পারে আর্টের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে। বিদেশ হইতে ধার করা কলা কৌশলকেও তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের রং দিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া তোলে।

সম্রাট শমোর আমলে (৭২৪—৭৪৮ খৃঃ) স্যাণ্ডাল কাঠের তৈয়ারী বিওয়া (Biwa) নামক বাদ্যযন্ত্রে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য এবং কলাকৌশলের নমুনা দেখা যাইত। ঐ যুগে কাঠের উপর খোদিয়া ঝিনুক ও ফুলের কাজ করা হইয়াছে। এই সবের নমুনা এখনও রক্ষিত আছে।

জাপানী তাস (Flower cards) ঐ দেশের আর্টের অন্যতম নিদর্শন। পঞ্চদশ্ শতাব্দী হইতে জাপানে তাস খেলা চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ পর্ত্তুগালের তাসখেলা জাপানে প্রবেশ লাভ করে ; পরে অবশ্য জাপানী কায়দায় এই খেলাকে রূপান্তরিত করা হয়। তাসগুলিও জাপানীরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী নূতন পরিকল্পনায় তৈয়ারী করে। একটা বাণ্ডেলে ৪৮ টী তাস ; প্রত্যেক গ্রুপে ১২টী তাস থাকে। এক একটা তাস ইংরেজী মাসের প্রতীক হিসাবে তৈয়ারী—বার মাসের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে রূপায়িত করে আর্টিষ্ট এই তাসগুলির উপর।

জানুয়ারী—একটা পাইন গাছ ও একটা সারস।

ফেব্রুয়ারী—প্রস্ফুটিত ফুল ও জাপানী একটা পাখী।

মার্চ্চ—বিকশিত চেরীফুলের বাহার ও একটা কারুকার্য্য-খচিত পর্দ্দা।

এপ্রিল—একটা কোকিল ও একরূপ জাপানী লতা; লতায় ঘেরা কুঞ্জবন—তার মধ্যে চলিয়াছে জাপানী নরনারী ধীর মন্থর গতিতে বাগানের দৃশ্য দেখিয়া চোখ জুড়াইতে।

মে—একজাতীয় জাপানী ফুল, একটা ছোট নদী ও তার উপর একটা সেতু।

জুন—বিকশিত পুষ্পগুচ্ছ এবং উড়ন্ত প্রজাপতির দল।

জুলাই—বন্য একটা বরাহ আর তার পাশে রহিয়াছে একটী জাপানী নারী - লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত সুন্দর প্রকৃতির কোলে।

অগাষ্ট—একটা পাহাড়, চন্দ্র আর বন্য রাজহাঁস।—হ্রদের উপর চাঁদের রূপালী জ্যোছনার কেলি। দূরে পাহাড়শ্রেণী আর হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া জাপানী মা তার ছেলেমেয়েদিগকে নিয়া চাঁদের হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে।

সেপ্টেম্বর—চন্দ্রমল্লিকা ফুল থরে থরে ফুটিয়া রহিয়াছে আর তারই পাশে একটা মদের পেয়ালা—নানারূপ কারুকার্য্যময় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে পেয়ালার গায়। কারিকরের বাহাদুরী বটে।

অক্টোবর—মেপল্ গাছের পাতাগুলি জড়াজড়ি করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে একটা জলাশয়ের উপর আর তারই পাশে রহিয়াছে একটা সচকিত মৃগ—জলাশয়ের মধ্যে নিজের ছায়া দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিয়াছে।

নভেম্বর—একটা উইলো গাছ—তার নীচে জাপানী ছাতা মাথায় একজন লোক বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছে।

আর আছে একজন সেই আদিম যুগের সাহিত্যিক—অন-নো-ডকু বলা হয় ইহাদিগকে।

ডিসেম্বর—এক জাতীয় জাপানী ফুল; অনেকটা এই দেশের টগর ফুলের মতো, আর একটা ফিনিক্সের মূর্ত্তি। এক একটা তাস জাপানী আর্টিষ্টের শিল্পী-মনের পরিচায়ক। ১২টা তাসের উপর শিল্পী কত দরদ দিয়া জাপানী প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে!

আনন্দ ও উৎসব

জাপানে বারমাসে তের পার্ব্বণ। সব সময় একটা না একটা উৎসব লাগিয়াই আছে। নববর্ষের উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়। বৎসরের ৫।৭ দিন ভরিয়া একটা না একটা অনুষ্ঠান চলে। নানারূপ আমোদ, প্রমোদ, খেলাধূলা, নাচগান, ঘুড়ী উড়ানো ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ছেলেমেয়েরা কিম্ভূৎকিমাকার কাগজের মুখোস পরিয়া খেলাধূলা করে আর এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়।

বৎসরের অন্যান্য সময় ছেলেরা ঘুড়ী উড়ায়, লাটিম ঘুরায় বা কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা করে। সেখানে পশু পক্ষীর লড়াইও হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় যেমন, চট্টগ্রামে ষাঁড়ের বা মহিষের লড়াই হইয়া থাকে। জাপনেও ষাঁড় বা মহিষের লড়াই দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক ময়দানে সমবেত হয়।

কাঠের পাতলা তক্তা দ্বারা কচ্ছপের মূর্ত্তি গড়িয়া কচ্ছপ নাচের ব্যবস্থা করা হয়। "তার চার পায়ে এবং মাথায় ও লেজে পয়সা লাগিয়ে ভারী করা হয়। সেই কাঠের কচ্ছপটা বড় ঘরের মাঝখানে রেখে দশ পনেরো জনে মিলে খুব জোরে পাখা দিয়ে বাতাস দিতে থাকে এবং চীৎকার করতে থাকে, "কচ্ছপ নাচে, কচ্ছপ নাচে।" পাখার বাতাসের তাড়নায় কাঠের কচ্ছপ মেঝের ওপরে নোড়ে বেড়ায় এবং প্রত্যেক

লোকেই বাতাস দিয়ে তাকে নিজের দিক হতে অন্য দিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।" (১)

"অনেক পাড়াগাঁয়ে ইয়ামিজিরু অর্থাৎ কালো ঝোল নামে এক রকম খেলা হয়। কোনো এক বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে কিংবা রাত্রিতে গ্রামের সকল যুবক যুবতী মিলে একটা প্রকাণ্ড কড়ায় ঝোল রাঁধে এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের খেয়াল মত তরিতরকারী, মাছ, মাংস ও মসলা সেই কড়ায় ফেলতে থাকে, কিন্তু কে কি দিচ্ছে তা অপর কাকেও জানতে দোয় না। এই পাঁচমিশালি জিনিসের উৎকট ঝোল রান্না হোলে সকলে খেতে বসে এবং ঝোলের মধ্য হতে নানাবিধ অদ্ভুত জিনিষ খুঁজে বার কোরে আমোদ করে।" (২)

ইশিকী টাউনে সুওয়া মন্দির। মন্দিরের মধ্যে প্রকাণ্ড আকারের বহু লণ্ঠন আছে। প্রতি বৎসর ২৬শা এবং ২৭শা আগষ্ট এই মন্দিরে এক লণ্ঠন উৎসব হইয়া থাকে। এই-গুলিকে 'বোকার লণ্ঠন'ও (Fool lanterns) বলা হয়। এই নামের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ঐ অঞ্চলে একটা গ্রাম্য গান প্রচলিত আছে যে যাহারা এই লণ্ঠনগুলি কোন সময় দেখে নাই তাহারা বোকা আর যাহারা এইগুলি দুই বার দেখে তাহারাও বোকা।

এই লণ্ঠনগুলিতে বাতি জ্বালানোর দৃশ্য বড় অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক। বহুলোক এক সঙ্গে এক একটি লণ্ঠনের মধ্যে

---

(১) জাপান—সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) জাপান—সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবেশ করিয়া ইহাতে বাতি জ্বালে। ২৭শা তারিখ বিকেলে বহুলোক মন্দির প্রাঙ্গণে একত্র হয় এবং সারারাত্রি এই বাতি জ্বালানোর দৃশ্য দেখিবার জন্য সেখানে কাটায়।

ঐ টাউনের লোকেরা ছয়টা দলে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক দল একজোড়া লণ্ঠন মন্দিরে উৎসর্গ করে। লণ্ঠনগুলি বিচিত্র ভাবে চিহ্নিত করা হয়। জাপানের অতীত ইতিহাসের অনেক ঘটনা এই সব চিত্রে রূপায়িত করা হয়।

এই লণ্ঠন উৎসবের উৎপত্তি হয় একটা প্রাচীন গল্প হইতে। ৮।৫ শত বৎসর পূর্বে ইশিকী অঞ্চলের সমুদ্র পাড়ের জায়গাগুলিতে একটা সামুদ্রিক দৈত্য প্রতিরাত্রেই অত্যাচার করিত। জনমানব, পশু পক্ষী, ফসলের ক্ষেত কিছুই বাদ যাইত না তাহার অত্যাচারের হাত হইতে। তাহার অত্যাচারে সব কিছু শ্মশানের মত হাহাকার করিত। গ্রামের লোকের কষ্টের আর সীমা ছিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া স্থওয়া মন্দিরে একটা তরবারি উৎসর্গ করিল, আগুন জ্বালিল আর সারারাত্রি দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল। তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, আবার গ্রামের মধ্যে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিল। দেবতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ঐ মন্দিরের সামনে প্রত্যেক উৎসবের সময় 'অগ্নি-প্রহরী' খাড়া করা হইত। এখন ঐ আগুনের পরিবর্তে লণ্ঠন জ্বালানো হয়। মন্দিরের মধ্যে প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন একটা লণ্ঠন আছে এবং যে তরবারির সাহায্যে দৈত্য তাড়ানো হইয়াছিল তাহা এখনও সযত্নে মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত আছে।

প্রতি বৎসর মে মাসে ওসাকা এবং টোকিয়োর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হামামাৎসু টাউনে ঘুড়ীর যুদ্ধ হয়—জাপানীদের প্রাণ-মন তাজা ও চাঙ্গা হইয়া উঠে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া। বসন্তের প্রকৃতি সবে মাত্র নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, গাছপালার পাতার রং গাঢ় হইতে গাঢ়তর রং ধারণ করিতে সুরু করিয়াছে, চারিদিকে একটা নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে—ঠিক এমনি সময় আয়োজন করা হয় এই ঘুড়ী-যুদ্ধের। জাপানের অন্যান্য স্থানেও ঘুড়ী-যুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে হামামাৎসু টাউনে যেরূপ অসংখ্য ঘুড়ী মহা জাঁকজমকে একটা মহাযুদ্ধে মাতিয়া উঠে তেমন আর কোথাও হয় না।

এই ঘুড়ী-যুদ্ধের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ঠিক ইতিহাস না বলিয়া গল্প বলিলেও চলে। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হামামাৎসু দুর্গের প্রভু কামী তাহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছেলের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটা মজার কাণ্ড করেন। তিনি ছেলের নাম একটা ঘুড়ীর মধ্যে লিখিয়া তাহা ঐ দুর্গের উপরে উড়ান। একটা উদ্দেশ্য নিয়াই হয়ত তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। তাহার সৈন্যদলের মধ্যে রণ-পিপাসা ও নেশা জাগাইয়া তোলাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। তাহার আকাঙ্ক্ষিত রণোন্মাদনার চিহ্ন পাওয়া যায় এই ঘুড়ী-যুদ্ধের মধ্যে। অবশ্য গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই অনুষ্ঠানের নানারূপ পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছে।

ঘুড়ী-যুদ্ধের সময় ঘনাইয়া আসিলে প্রত্যেক রাস্তায় আয়োজনের ধুম পড়িয়া যায়। প্রত্যেক রাস্তার জন্য বহু ঘুড়ী তৈয়ারী হয়। প্রত্যেক ঘুড়ীর মধ্যে থাকে ঐ রাস্তার কোন একটা

দলগত বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। ঘুড়িগুলি চারি কোণাকার—একটা লম্বা দড়ি বাঁধিয়া ঘুড়ির লেজ করা হয়, নানাপ্রকার রঙে রঞ্জিত হয় এই লেজখানা। যাহারা ঘুড়ি উড়াইবে তাহারা বিচিত্র যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া 'মার্চ্চ' করিতে অভ্যাস করিতে থাকে। ৫০ এর অধিক ভিন্ন ভিন্ন দল ৫০০ এর বেশী ঘুড়ি নিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যায়।

যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেদিন তেজস্বী যুবকেরা গায়ে নীল বর্ণের পায়জামা, দলের নামাঙ্কিত 'হাপি' পরিয়া এবং মাথায় 'হাচিমাকি' বাঁধিয়া 'ওয়াস হো, ওয়াস হো' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিরাটাকার ঘুড়ি নিয়া 'মার্চ্চ' করিতে করিতে মাঠে যায়। ঘুড়ি উড়াইয়া চলে সামনে একদল, আর তার পেছনে সারিবদ্ধভাবে একদলের পর একদল 'মার্চ্চ' করিয়া যায়। মাঠের চারিদিকে ইহারা 'পেরেড' করিতে করিতে জয়োল্লাসে মাতিয়া উঠে। সে দৃশ্য কী সুন্দর!

তারপর আরম্ভ হয় যুদ্ধ। যুদ্ধের ডাইরেক্টার ঠিক সময়ে সিগ্‌নেল দেওয়া মাত্র শত শত ঘুড়ি শূন্যে উড়িতে থাকে। আর তখন আরম্ভ হয় ঘোরতর যুদ্ধ—ঘুড়ীর সূতা কাটাকাটির অদ্ভুত দৃশ্য। কোন ঘুড়ি অন্য ঘুড়ির সূতা কাটিয়া ফেলিতে পারিলে চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। আবার সেই জয়ী ঘুড়ি অন্য ঘুড়ির সঙ্গে লড়াই করিতে থাকে। যে হারিয়া গেল সে আবার অন্য একটা ঘুড়ি নিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। এক মুহূর্ত্তেরও বিরাম নাই—যুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে চলিতে থাকিবে। শূন্যে অসংখ্য

ঘুড়ি উড়িতেছে—যেন ঘুড়ির পুঞ্জীভূত মেঘ, আর উপস্থিত জনতার গগনভেদী জয়োল্লাস—মনে হয় যেন বিশাল মাঠ এখনই ফাটিয়া চুরমার হইয়া যাইবে—যেমন হয় বোমা নিক্ষেপের ফলে।

দিনান্তের ম্লান রেখা পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য্যের গায়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আর অমনি ডাইরেক্টার সিগনেল দেওয়া মাত্র যুদ্ধ থামিয়া যায়। প্রত্যেক দল তখন গান গাহিতে গাহিতে বাজনা বাজাইয়া, মটরে চড়িয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া যায়। সকলের মুখেই দেখা যায় তখন একটা আনন্দের চিহ্ন।

কিয়োটোর নৌ-খেলা (boat race) দেখিবার জিনিষ। কিয়োটোর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম—চেরীফুলের বাহার, প্রবাহিনী জলস্রোতের উপর দোলায়মান সবুজ পাতার ছায়া-বিতান, মনোহারী দিগন্ত রেখা, স্বচ্ছ সোতস্বিনীর অবিরল কলকল ধারা কিয়োটোকে ভূস্বর্গ করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনকালে সহস্র বৎসরাধিক কাল জাপানের রাজধানী ছিল এই কিয়োটো। তখনকার হেইয়ান বংশের (খৃঃ ৭৮১-১১৮২) দরবারের গণ্যমান্য লোকেরা নৌকা বিহারে যাইতেন—কারুকার্য্যখচিত নৌকা, বৈঠার দিকে অজগর সাপের মাথা ও ফিনিক্সের ঘাড়। স্বচ্ছ জলস্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইত ময়ূরপঙ্খী নৌকা আর সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনার আসর জমিয়া উঠিত পূরাদমে।

শিমোসাগার কুরুমাজাকী মন্দিরে প্রতি বৎসর এই সুপ্রাচীন নৌ-বিহারের অনুষ্ঠান এখনও হইয়া থাকে। ঠিক অনুষ্ঠান নয়—অনুকরণ। সেই সুদূর অতীতের অনুষ্ঠানের অনুকরণে জাপানীরা নৌ-বিহারের আয়োজন করিয়া থাকে। দর্শকবৃন্দ

এই আয়োজনের মধ্যে অতীতের স্বপ্ন-রাজ্যের পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধুর পরশ পাইয়া নিজকে ধন্য মনে করে।

প্রতি বৎসর ১১ই মে এই নৌ-বিহার হইয়া থাকে। ঐ দিন বিকালে নানা বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত একটা মিছিল কুরুমাজাকী মন্দির হইতে বাহির হইয়া য়ই (oi) নদীর তীরস্থ আরাশীয়ামা নামক স্থানে 'মার্চ্চ' করিয়া যায়। মিছিলের মধ্যভাগে থাকে একটা পবিত্র পালকী। নদীর মধ্যে একটা দ্বীপ—পাড়ের সঙ্গে ব্রিজ দ্বারা সংযুক্ত। মিছিলের সব লোক দ্বীপে গিয়া নৌকায় চড়ে। নৌকা ঠিক একটী নয়—৪০।৫০টা। 'গোজা' (পবিত্র নৌকা) থাকে ঐ মিছিলের মধ্যভাগে। তারপর সুরু হয় নৃত্যগীত আর বিচিত্র বাদ্যের ঝণাৎকার। নদীর গভীর, নিস্তব্ধ জলরাশির উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নৌ-বহর ধীর মন্থর গতিতে, আর তার মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে আনন্দোল্লাসের তাণ্ডব নৃত্য; ছেলেরা একটা নৌকায় প্রজাপতি-নৃত্য করিতেছে—সব মিলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে একটা বিচিত্র সমারোহের ঘটা। নৌ-বিহার নয় যেন নৌ-বহরের একটা সচল ছবি দর্শকের নয়নপটে জ্বলন্ত ছবি অঙ্কিত করিয়া দেয়।

সন্তরণ বিদ্যায় জাপানীরা বিখ্যাত। জাপান অসংখ্য নদী-নালা, খাল, বিল, হ্রদ, সাগর, উপসাগরের দেশ। জাপানকে একটা অখণ্ড দেশ না বলিয়া সমুদ্রে ভাসমান একটা দ্বীপশ্রেণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই জাপানী যুবকেরা স্বভাবতঃই সন্তরণপটু হইবার সুযোগ ও সুবিধা পায়।

জাপানের প্রাচীন ইতিহাসেও সন্তরণপটু যুবকদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে জাপানীরা

সন্তরণ-কৌশলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন জাপানের ইতিহাস 'নিহন শোকী'তে পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দে সম্রাট সুজীনের রাজত্বে গ্রীষ্মকালে আমোদ উৎসবের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল সন্তরণ।

ফিউডেল (Feudal) আমলে সন্তরণের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা জাপানীরা সবিশেষ উপলব্ধি করে। শারীরিক ব্যায়াম হিসাবে ইহাকে তখন গ্রহণ করা হয়; মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসূচীর মধ্যে স্থান পায় সন্তরণ।

পরিখা দ্বারা বেষ্টিত শত্রুর দুর্গ জয় করিতে হইলে যে সন্তরণপটু হওয়া দরকার একথা জাপানী যোদ্ধারা শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। ইহা ছাড়া সন্তরণপটু যোদ্ধারা আরও নানাভাবে যুদ্ধ-জয় সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। গভীর নিশীথে শত্রু সৈন্যের অগোচরে পরিখা সাঁতরাইয়া পার হইয়া গিয়া আরও সৈন্যের জন্য তাগিদপত্র অনায়াসে বিলি করিয়া আসা যায়। 'সামুরাই' জাপানের প্রাচীন যোদ্ধজাতি। যাহারা সন্তরণ জানিত না সেই সব সামুরাই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইত না।

মধ্য-যুগের সাহিত্যে সন্তরণপটু যোদ্ধাদের বীরত্ব-সূচক কীর্ত্তিকলাপের অপূর্ব্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। একজন সামুরাই লৌহবর্ম্ম পরিহিত অবস্থায় ৬ মাইল সমুদ্র সাঁতরাইয়া আত্মরক্ষা করে। মাথায় ছিল তাহার একটা প্রকাণ্ড লৌহ-শিরস্ত্রাণ।

টকুগাওয়া বংশের রাজত্বকালে সন্তরণ-শিক্ষা সৈন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। ঐ যুগে বিভিন্নরূপ সন্তরণ-রীতি আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হয়।

বর্ত্তমান যুগে জাপানের প্রায় সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গ্রীষ্ম-কালে সপ্তাহ কালের জন্য সন্তরণ শিখিয়া থাকে। নানাস্থানে সন্তরণ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সব সমিতি যুবক যুবতীদিগকে সন্তরণপটু করিয়া তোলে।

অধুনা জাপানীরা পাশ্চাত্য ধরণের সন্তরণ অভ্যাস করিতেছে। মূলতঃ দুইএর মধ্যে বেশী কোন পার্থক্য নাই, তবে জাপানী সন্তরণের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে প্রথমতঃ যুদ্ধের তাগিদে। কাজেই পাশ্চাত্য রীতির সন্তরণে যতটা সৌষ্ঠব, আর্ট বা কায়দার মারপ্যাঁচ দেখা যায় জাপানী রীতিতে হয়ত ততটা নাই। প্রথমটায় আছে গতি (speed), কারণ প্রতিযোগিতার জন্যই প্রধানতঃ পাশ্চাত্যে সন্তরণ আদর পাইয়াছে; আর দ্বিতীয়টায় আছে সামরিক কৌশল।

জাপানে জলের নীচে সন্তরণ দিবার প্রথাও প্রচলিত আছে। শত্রুদের জাহাজ জলের নীচে গিয়া ধ্বংস করার জন্য এই ধরণের সন্তরণ-কৌশল সৈন্যদের শিখিতে হইত।

জাপানে সন্তরণক্ষেত্রে নানা স্কুলের আবির্ভাব হইয়াছে যথা,—সুইকু, ইয়ামানৌচী, টহসুইজুংসু ইত্যাদি। ইয়ামানৌচী স্কুলের রীতি অনুযায়ী হাতে পতাকা কিংবা ছোট বন্দুক, তীর, ধনুক বা লিখিবার ব্রাশ নিয়া সাঁতরাইবার কৌশল প্রচলিত আছে। চিৎভাবে সাঁতার দিতে দিতে ব্রাশ দিয়া কাগজের উপর লেখা হয়—দুই হাতই তখন জলের উপর। টহসুইজুং সু রীতি কুমামটো প্রদেশে প্রচলিত। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে এই রীতি অনেকটা নির্দ্দিষ্ট আকার পায়। ঐ প্রদেশের শাসকগণ বংশানু-

ক্রমিকভাবে এই রীতির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। সামুরাইগণকে সন্তরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হইত। এই রীতিতে জলের নীচে সন্তরণ দিবার কায়দাও খুব উন্নতি লাভ করে।

সুইকু রীতিতে কাৎ হইয়া সাঁতার কাটা হয় খুব বেগবতী স্রোতস্বিনীর মধ্যে। কাৎ হইয়া সাঁতার দিলে জলের চাপ অনেকটা এড়াইয়া চলা যায় এই তাহাদের ধারণা।

আমাদের দেশেও আজকাল ফুটবল, ক্রিকেটের মতো সন্তরণের দিকেও ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এদেশের বহু নামজাদা সন্তরণকারী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। প্রফুল্ল ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকজন Endurance Swimmingএ record স্থাপন করিয়াছে। জাপানের দৃষ্টি এখনও যেন এইরূপ সন্তরণের দিকে পড়ে নাই।

জাপানীরা সন্তরণকে কেবল যে শারীরিক ব্যায়াম-কৌশল বলিয়াই মনে করে তাহা নহে। সন্তরণকারীরা দুনিয়ার সব দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ভুলিয়া যায়, মন তাহাদের স্থির, ধীর, শান্ত-সমাহিত, এতটুকু ভাববিকার সেখানে নাই, তাহারা যেন কাহার আরাধনায় নিমগ্ন। আধ্যাত্মিক ট্রেণিং পাওয়া যায় এই সন্তরণের মধ্যে।

ঐদেশেও সন্তরণ দেখিবার জন্য আমাদের দেশের মতো হাজার হাজার লোক নদী, সমুদ্র বা হ্রদের তীরে ভিড় জমায়।

ধর্ম্ম

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী জাতির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাপানী কালচার, আর্ট, সাহিত্য ও ইতিহাস বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে এমন নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত যে, জাপানী জীবন ও চিন্তাধারাকে কিছুতেই ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জাপানী সভ্যতা, আচার ব্যবহার কিংবা দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত খুঁটিনাটী ব্যাপারে ইহার প্রভাব খুব বেশী। কাপড়ের সূক্ষ্ম তন্তুর মতোই জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে ঐ ধর্ম্ম তাহাদের জীবন ও সভ্যতার সঙ্গে। জাপানী চিত্রাঙ্কণ—কৌশল, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য, ইতিহাস এবং কালচার সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলনীতি ও শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'; 'জীবে দয়া এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন' বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম মূলনীতি। জাতকে বর্ণিত গল্প হইতে দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা, উদারতা, দানশীলতার মহান, সুউচ্চ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। বিমলকীর্ত্তি ছিলেন একজন বৌদ্ধ সংসারী লোক। জগতের অন্যান্য অধিবাসীরা পীড়িত এবং অসুস্থ, কাজেই তিনি নিজকেও অসুস্থ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং যে পর্য্যন্ত অন্যদের পীড়া দূর না হইবে সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের পীড়াও দূর হইবে না এ কথাও প্রচার করিয়া দিলেন। এ আধ্যাত্মিক পীড়া নয় কি? কামাকুয়া নামক জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পীড়িত, আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; মানুষের সেবা করিয়াই তিনি শান্ত হন নাই, পশু-পক্ষীর সেবাও তিনি করিয়াছেন।

জনৈক বৌদ্ধ সমালোচক বলেন, "প্রথম যুগে বৌদ্ধ পুরোহিত-গণ সুষ্ঠু, সুন্দর জীবনযাত্রার আদর্শ ও উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা অনেকেই আমোদ প্রমোদ, মদ্যপান, ভোজ, সাজ-সজ্জা ও বাহুল্যময় দামী পোষাক পরিধান, মানুষ ও জীবজন্তুর উপর নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার এবং বাহ্য চমক ও ঘোর সংসারীপনার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা পরিহার এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে পুরোহিতগণ এবং তাহাদের অনুচরগণ আবার বুদ্ধের অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিবে।" তাঁহার আশা ফলবতী হইবে কি ?

"মৃত কখনও মরে না"—এই হইল বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যবহারিক শিক্ষা। বুদ্ধের শিষ্যেরা একথা বিশ্বাস করে ; মৃত সর্ব্বদাই জীবিত—মন্দিরে, বাড়ীতে এবং জীবিত ব্যক্তিগণের অন্তরে। জীবিতের মতোই মৃতের উদ্দেশ্যেও ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিত হয়, তাহাদের স্মৃতির পূজা করা হয়। কেবল মন্দিরেই যে মৃতের উদ্দেশ্যে লিখিত স্মৃতি-ফলক সযত্নে রক্ষিত হয় তাহা নয়, প্রত্যেক বাড়ীতে একটা 'বুৎসুদন' মন্দির বা অর্চ্চনা-গৃহ আছে। সেখানে মৃতের স্মৃতি-ফলক রহিয়াছে এবং প্রত্যহ মোমবাতির আলোকে স্তোত্র পাঠ করিয়া খাদ্য, চাউল, ফুল, ধূপধুনা ইত্যাদি মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক মাসে ও বৎসরে মৃতের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে একটা উৎসব-অনুষ্ঠান করা হয়। এসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতিকে চির জাগ্রত, জীবন্ত ও তাজা রাখা হয়—মনে হয় যেন মৃত মরিয়াও

মরে নাই, এখনও যেন সে পরিবারের অন্য দশ জনের মতো একজন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা পূর্ব্বপুরুষ-পূজারই নামান্তর কিন্তু এই পূজা স্মৃতিরই পূজা। ইহাতে দোষের এমন কি আছে?

১০০০ হাজার বৎসরের বেশী হইল চীনের মারফত বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। কোরিয়ার রাজাদের মধ্যস্থতায় ৫৫২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম চীনের মারফত ভারত হইতে জাপানে আমদানী করা হয়। পরবর্ত্তী ৩৬ বৎসর জাপানীরা এই ধর্ম্মের বিরোধীতা করে। সম্রাট য়োমেই (Yomei)-এর দ্বিতীয় ছেলে টাইশী (Taishi)-এর চেষ্টায় পরে এই ধর্ম্ম সেখানে বিস্তার লাভ করে। জাপানীদের জাতীয়তা-বোধ ও ধর্ম্মজীবনের অদ্ভুত সমন্বয় সংঘটিত হয় এই ধর্ম্মের কল্যাণে। কাজেই ইদানীং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য জোরেসোরে চেষ্টা চলিয়াছে। একদিকে 'বৃহত্তর জাপান' সৃষ্টির কল্পনা জল্পনা, আর সেই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য ডিপ্লোমেসীর ক্ষেত্রে তুষ্ণীভাব পরিত্যাগ করিয়া একটা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা; সঙ্গে সঙ্গে জাপানী প্রাণে নূতন প্রেরণা, অনুভূতি ও দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য "Nippon spirit movement" আন্দোলন দেশব্যাপী করিয়া তোলা ও তন্দ্রাবিষ্ট জাতীয় চেতনাকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া সচেতন করা, আর অন্য দিকে আত্মপ্রকাশ করিল জাপানকে নূতন ভাবে ধর্ম্মের কাহিনী শোনাইবার জন্য একটা তীব্র আন্দোলন বা "Revival of Religious movement"—নূতন ভাবে জাপানীকে ধর্ম্মের বাণী শোনাইবার প্রচেষ্টা।

এই আন্দোলনে বৌদ্ধধর্ম্মেরই বেশী লাভ হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম যথা, শিন্টো, খৃষ্টিয়ান ইত্যাদি ধর্ম্মও নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে। খৃষ্টিয়ান মিশনারীরা তাহাদের ধর্ম্মকে জাপানী ভাবে দীক্ষিত করিয়া ও তাহাকে জাপানী সাজ-সজ্জা পরাইয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে যাহাতে জাপানীরা ইহার দিকে আকৃষ্ট হয়। জাপানীরা এই প্রচেষ্টার নাম দিয়াছে Japanising of Christianity। গত কয়েক বৎসর যাবৎ মিশনারীরা এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত জাপানী খৃষ্টানেরা জাপানের গ্রামে গ্রামে মিশন স্কুল স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছে। কেবল ১৯৩৪ সনে এইরূপ ৪০টী নূতন স্কুল গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়।

ধর্ম্মব্যাপারে জাপান খুবই উদার নৈতিক। ইদানীং সেখানে নানা ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে; এক বাপের এক ছেলে হয়ত শিন্টো মতাবলম্বী, অন্য ছেলে বৌদ্ধ মতাবলম্বী, অন্য একজন ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী আবার আর এক ছেলে খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্ম ব্যাপারে জাপানী পিতা কোন কড়াকড়ি করেন না; নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা একই পরিবারে বেশ সুখে শান্তিতে বাস করে। এখানে একটা কথা মনে পড়ে। চেকোশ্লোভেকিয়ায় একই পরিবারে চেক, জার্ম্মান, শ্লোভাক ইত্যাদি নানা জাতির বাস—কাহারও সঙ্গে কাহারও কোন বিরোধ নাই। সেখানে অবশ্য ধর্ম্ম একই, কেবল জাতি বিভিন্ন। আর জাপানে জাতি এক, ধর্ম্ম বিভিন্ন। দুই দেশে দুই দৃশ্য!

সুপ্রাচীন কাল হইতে—যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে প্রবেশ করে নাই—জাপানে শিন্টোধর্ম্ম প্রচলিত। শিন্টো চীনা শব্দ, অর্থ,

দেবতাদের মত ও পথ (The way of Gods)। পূর্ব্বপুরুষদের স্বর্গত আত্মার, প্রকৃতির এবং কল্পিত দেব-দেবীর মানস-মূর্ত্তির abstract পূজা এই ধর্ম্মে বিধিবদ্ধ আছে। কোন জাপানী সমালোচক বলেন, "In these days of scientific civilization, these religions pregnant with mystic elements prosper and thrive!" অধুনা এই ধর্ম্মের নানা শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে যথা, 'টেনরিকো,' 'সামোটোকিয়ো,' 'হিটনোমিচি কিয়োদান' ইত্যাদি। 'টেনরিকো' ১৮৩৮ অব্দে প্রথম প্রচারিত হয় কিন্তু পরবর্ত্তী ৫০ বৎসর বেশী কোন কাজ করিতে পারে নাই। গত ৫০ বৎসরের ভিতর এই ধর্ম্মমত জাপানে, এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-সমুদ্র-দ্বীপপুঞ্জ, চীন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তার ও প্রতিপত্তি লাভ করে। এই মতাবলম্বীর লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও বেশী।

বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা ও বস্তুতান্ত্রিকতার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া নানা বিকট সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করে এই ধর্ম্মমত। দুঃখবাদী অদৃষ্টবাদ এবং হতাশভাবে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ইহা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে শিক্ষা দেয় এই অতি আধুনিক ধর্ম্মমত। এই গভীর গূঢ়ার্থসূচক ধর্ম্ম ব্যবহারিক জীবনে পালন করা খুবই সহজ। এই মতাবলম্বীরা আত্মার অমরত্বে এবং পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে। মৃত্যু অর্থ, তাহাদের মতে, পুনরায় ফিরিয়া আসা ; একই জীবন বহুবার মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করিবে।

ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'টেনরিকো' সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংরেজ মিশনারীদের মত নানাবিধ জনসেবার কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের অধীনে অনেক স্কুল, পল্লীমঙ্গল-সমিতি, লাইব্রেরী, আর্ত্তের সেবাকেন্দ্র, নার্সারী বিদ্যালয় ইত্যাদি রহিয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে ইহাদের গীর্জ্জার সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার।

১৮৭৬ সালে সর্ব্বপ্রথম জাপানে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ১৯০৯ সনে প্রথমতঃ একদল জাপানী মক্কায় হজ করিতে যায়। ১৮৭৬ সালে য়ুরোপ প্রবাসী একজন জাপানী ছাত্র হজরত মহম্মদের একখানা জীবনী লেখেন—তারপর অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিত মহাপুরুষ মহম্মদের জীবন নিয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর অনেক জাপানী মুসলমান হজব্রত সমাপন করিয়াছে। আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জাপানী মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করে। জাপানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০ এর বেশী হইবে। অদূর ভবিষ্যতে আজহার প্রত্যাগত ছাত্রবৃন্দের উৎসাহে হয়ত দ্রুতবেগে ইস্‌লাম সেখানে বিস্তারিত হইবে।

সম্প্রতি (১৯৩৮ সনের ১২ই মে তারিখে) টোকিয়ো সহরে জাপানীদের নৈতিক এবং আর্থিক সাহায্যে এক বিরাট মসজিদ স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোবে সহরেও এক বিরাট মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। য়েমেনের যুবরাজ খুব শান সওকতের মধ্যে এই মস্‌জিদের উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মুস্‌লিম জাহানের বহু নামজাদা মুসলমান টোকিয়োতে হাজির হইয়াছিলেন। মাঞ্চুয়াকু, চীন, ভারত, আরব, তুরস্ক,
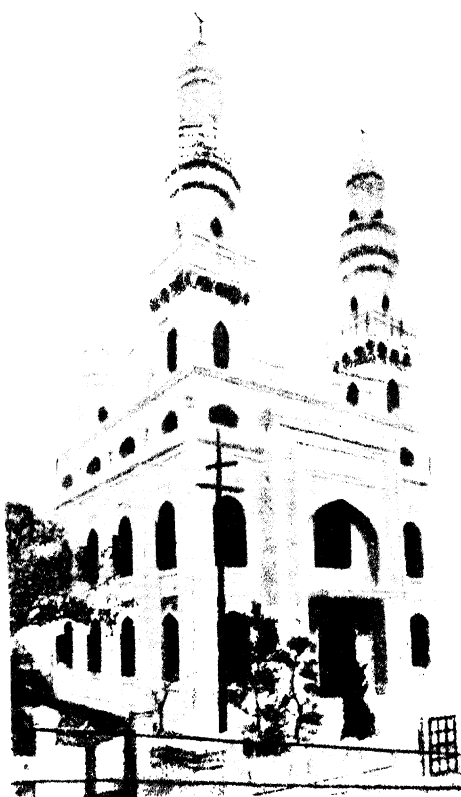
কোবের বিখ্যাত মসজিদ

মালয়, ইরাণ, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মুসলমানেরা এই উপলক্ষে সেখানে গিয়াছিলেন। নানাদেশীয় প্রতিনিধিবৃন্দ কয়েক দিন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জাপানী শিষ্টাচার এবং আতিথেয়তা উপভোগ করিয়াছিলেন। ইসলামিক ভ্রাতৃত্বে জাপান বিশ্বাসী এবং ইস্‌লামিক শান্তি যে কেবল কথার কথা নয় একথাও জাপানীরা আজ বুঝিতে পারিয়াছে।

সম্প্রতি জাপানে 'Die Nippon Islamic Society' নামে এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জাপান ও অন্যান্য মুস্‌লিম জাতির মধ্যে মিলন স্থাপন করিয়া কিরূপে বিশ্বশান্তি এবং মানব-সেবার ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায় সে উদ্দেশ্যেই এই সমিতি জন্ম লাভ করিয়াছে। 'The Osaka Mainichi' পত্রিকার ১৯৩৮—২৯ মে তারিখের সংখ্যায় এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—"Stronger ties of friendship between Japan, the stabilising power in East Asia and the Islamic Countries in Asia and Africa will constitute one of the most powerful factors affecting the destiny of the world, especially in view of their common stand against the Red menace". সম্প্রতি পত্রিকায় দেখা গেল যে য়েমেনের সঙ্গে জাপানের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। এই সবের উদ্দেশ্য কি? একি কোন রাজনৈতিক চাল না এর মধ্যে আন্তরিকতাও আছে?

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধ

জাপান কি চায়? প্রধান মন্ত্রী কনোয়ী (Konoye) জাপান ডায়েট বক্তৃতায় ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে বলিয়াছেন, "What Japan wanted of China was not her teritory, but her co-operation".

জাপান কৃষিশিল্পে উন্নতি এবং প্রসারের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এশিয়ার প্রধান স্থলভাগে জাপানকে রাজ্য বিস্তার করিতেই হইবে। চীন ও জাপানের সহযোগিতার উপরই জাপানী সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। জাপান উত্তর চীনের অনুন্নত প্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চায়। চীন এক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করিলে চীনেরই উপকার হইত।

আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিণ্ডমার্শ (A. E. Hindmarsh) "The basis of Japanese foreign policy" নামক একখানা বই-এ জাপানের পররাষ্ট্রনীতির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'The foreign policy of Japan, as of most powers is essentially the circumference of a circle, the centre of which includes difficult domestic problems... Underlying Japan's foreign policy, we must recognise three internal problems which motivate her national policy and determine her attitude

towards the rest of the world. These motives can cryptically be called face, food and fear : (1) the demand for national prestige and equality ; (2) the demand for economic assurance ; (3) the demand for national security".

জাপানের মোট পরিমাণ ফল ১৪৮০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ৭ কোটীরও অধিক লোক বাস করে। চাষাবাদ করা যায় এরূপ জমীর হিসাবে সেখানে প্রতি বর্গ মাইলে ২৭৫০ জন লোক বাস করে। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত ভিড় নাই। জাপানকে বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদ করিয়াও জাপানের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যার অন্ন-সমস্যার সমাধান করা যায় না।

বাকী রহিল শিল্পবাণিজ্য। এক্ষেত্রে অবশ্য উন্নতি ও প্রসারণের স্থান এখনও আছে। জাপানী শিল্পদ্রব্য দেশ বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচা মাল-মশলা আমদানী করা হয়। জাপানকে পেটের দায়ে দেশের বাহিরে আধিপত্য বিস্তারের আয়োজন করিতে হইতেছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে জাপান অন্যান্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৪ সনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৪০টী দেশ জাপানী আমদানীর উপর বাণিজ্য শুল্ক বসাইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও জাপানকে রেহাই দেয় নাই।

এমতাবস্থায় জাপান কি করিবে ? প্রতিবেশী চীন সাম্রাজ্যকে জাপানী শিল্পদ্রব্যের এক বিরাট বিপণিতে পরিণত না করিয়া

আর উপায় কি? চীনে বিবিধ প্রকার কাঁচা মালের অফুরন্ত ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে। জাপান এইসব কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া নিতে পারে এবং আপন দেশে উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যাদি চীনে রপ্তানি করিতে পারে। ইহাতে চীনের লাভ ভিন্ন আর্থিক ক্ষতির বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। চীনদেশে এ পর্য্যন্ত জাপান ৩০ কোটী পাউণ্ড মূলধন বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যে খাটাইয়াছে। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ২৪ ভাগই চীনের সঙ্গে। চীনে যত বিদেশী লোক বাস করে তাহার ⅔ দুই তৃতীয়াংশ জাপানী। সুতরাং চীনকে না হইলে জাপানের চলিতে পারে না।

সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিজম্-এর ভীতি যে জাপানের নাই এমন নয়। চীনদেশে সোভিয়েট নীতির প্রচারের ফলে তথায় জাপানীদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব আস্তে আস্তে বদ্ধমূল হইতেছে। জাপান মনে করে এই কমিউনিজম্-এর প্রচারের ফলে চীনদেশে তাহার আর্থিক ও কূটনৈতিক ব্যাপারে ভীষণ স্বার্থহানির আশঙ্কার কারণ ঘটিতেছে। সমগ্র এশিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে চীনদেশে এই কমিউনিজম্-এর মতবাদ যাহাতে দ্রুত প্রচার লাভ না করিতে পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা জাপানের কর্ত্তব্য।

১৯২৭ সনে রাশিয়ান কমিউনিষ্টদের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া চীনদেশে যে এক ন্যাশনেলিষ্ট পার্টি গড়িয়া উঠে তাহারা কতিপয় বিদেশী শক্তির সাম্রাজ্যবাদ-নীতি ধ্বংস করিতে প্রয়াসী হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জাপানকে মনে